CENTRE FOR DISTANCE & ONLINE EDUCATION
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY

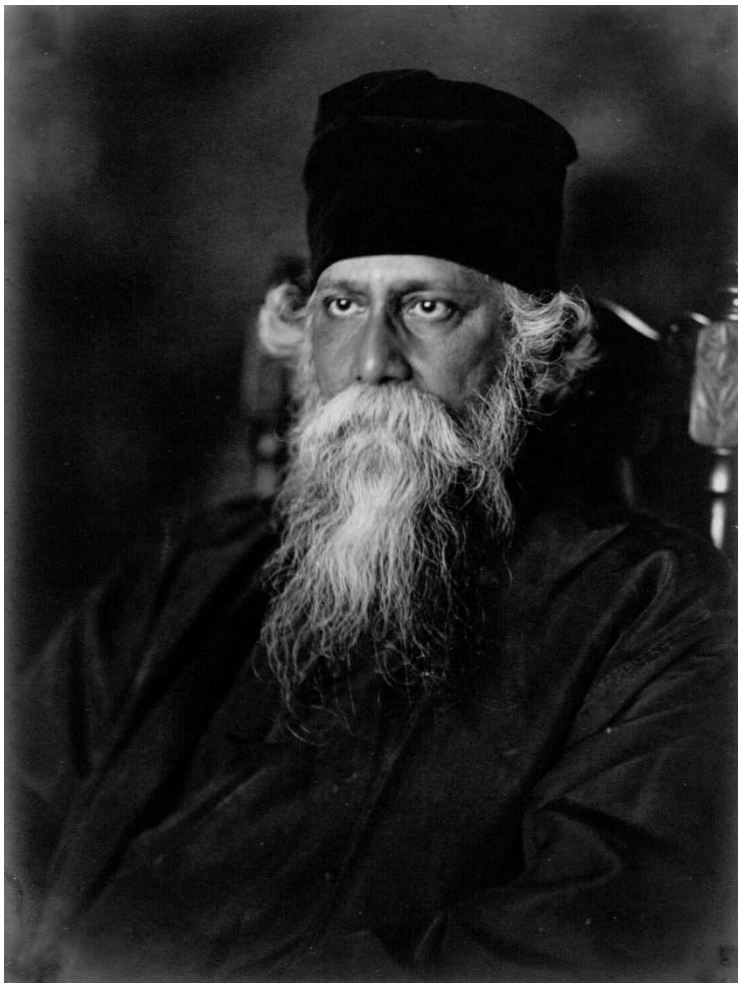

Self-Learning Materials

for

M.A. (POLITICAL SCIENCE)

(Under CBCS)

Semester	C.C	Units
1	1.5	1–8

Rabindra Bhavan, EE 9 & 10, Sector – II, Salt Lake City, Kolkata – 700050, Phone - (033) 23584014/ 4016/ 4018
Website: www.rbudde.in, E-mail: director.cdoe@rbu.ac.in

COURSE CONTRIBUTORS

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Asru Ranjan Panda	Former Professor	Department of Political Science, Scottish Church College
Debnarayan Modak	i)Former HOD & Professor ii) Former Professor and Director	i)Department of Political Science with Rural Administration, Vidyasagar University ii) School of Social Sciences, Netaji Subhas Open University
Kuntal Mukhopadhyay	Former Head and Retired Associate Professor	Department of Political Science, Raja Peary Mohan College, University of Calcutta
Satyabrat Sinha	Assistant Professor	Department of Political Science, Presidency University
Kunal Debnath	Assistant Professor	Department of Political Science, Rabindra Bharati University
Swatilekha Bhattacharya	Assistant Professor	Department of Political Science with Rural Administration, Vidyasagar University
Anandita Biswas	Assistant Professor	Department of Political Science, Diamond Harbour Women's University
Malay Mandal	Assistant Professor	Department of Political Science, Rabindra Bharati University

COURSE EDITOR

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Sumit Mukherjee	i)Professor & ii)Director	i) Department of Political Science, University of Kalyani & ii)Centre for Studies on Bengali Diaspora, University of Kalyani

EDITORIAL ASSISTANCE

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor in Political Science	Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University

March, 2021 © Rabindra Bharati University

All rights reserved. No part of this SLM may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Rabindra Bharati University, Kolkata.

Printed and published on behalf of the Rabindra Bharati University, Kolkata by the Registrar, Rabindra Bharati University.

Printed at East India Photo Composing Centre

69, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata – 700 006

C.C : 1.5
Political Theory in Indian Context Since Independence

Contents

Unit 1.	Democracy in Indian Context	1-14
Unit 2.	Civil Society and Political Society with specialreference to Partha Chatterjee	15-23
	Ashish Nandy and Sudipta Kaviraj	24-35
Unit 4.	Multiculturalism in Indian Context with special reference to Rajni Kothari	36-45
Unit 5.	Secularism in Indian Context with special reference to Ashish Nandy and T.N. Madan	46-58
Unit 6.	Eco-Feminism with special reference to Vandana Shiva	59-69
Unit 7.	Development and Democracy with special reference to Atul Kohli and Amartya Sen	70-79
Unit 8.	Subaltern Studies with special reference to Spivak and Ranajit Guha	80-93

পাঠক্রম : ১.৫

Unit-1

গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও ভারতে তার প্রয়োগ
(Democracy in Indian Context)

গঠন :

১.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ প্রত্যক্ষ (Direct) ও পরোক্ষ (Indirect) গণতন্ত্র

১.৪ ভারতের গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রকাশ ও প্রকৃতি

১.৫ ভারতে গণতন্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ

১.৬ ভারতের গণতন্ত্রের বিকাশের পথে বাধার সমূহগুলি

১.৭ উপসংহার

১.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

১.৯ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

১.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীগণ ধারণা লাভ করতে পারবে—

ক) গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রকার ও ভারতে তার অর্থ ও প্রকৃতি,

খ) ভারতে গণতন্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ ও ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং

গ) ভারতে গণতন্ত্রের বিকাশের পথে সঙ্কট ও তাঁর দূরীকরণের প্রয়াস।

১.২ ভূমিকা

বাংলার 'গণতন্ত্র' শব্দটি ইংরেজি 'ডেমোক্রাসি' (Democracy) থেকে উদ্ভূত এবং এই ইংরেজি 'ডেমোক্রাসি' শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ 'ডেমস' (Demos) এবং 'ক্রাটোস' (Kratos)-এর সমন্বয়ে গঠিত। 'ডেমস' শব্দের অর্থ হল 'জনগণ' এবং 'ক্রাটোস' শব্দের অর্থ হল ক্ষমতা। অর্থাৎ 'ডেমোক্রাসি' বা 'গণতন্ত্র' হল জনগণের ক্ষমতা। ভারতে গণতন্ত্র প্রয়োগের বিষয়টি আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করে ভারতে তার প্রয়োগ, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সীমাবদ্ধতা, ইত্যাদির মূল্যায়ন করব।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের (Abraham Lincoln) ভাষায় গণতন্ত্র হল জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের

জন্য শাসন ব্যবস্থা (of the people, by the people and for the people)। অর্থাৎ গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

১.৩ প্রত্যক্ষ (Direct) ও পরোক্ষ (Indirect) গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সাধারণত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র। 'প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র' (Direct Democracy) বলতে বোঝায় এমন এক শাসন ব্যবস্থা যেখানে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন কার্যে অংশগ্রহণ করে। প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলিতে এইরকম শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, একটি বিশেষ জায়গায় সমবেত হয়ে নাগরিকগণ রাষ্ট্র কার্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন। আইন প্রণয়ন, আইন বলবৎ করা, বিচারকার্য সম্পাদন করা সব কাজই নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে করতেন।

কিন্তু প্রাচীন গ্রীসে সীমিত জনসংখ্যার নগর রাষ্ট্রে যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব ছিল, বৃহৎ রাষ্ট্রে বা অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাষ্ট্রে তা সম্ভব নয়। এছাড়া বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় শাসন পরিচালনা করা কঠিন এবং বিভিন্ন জটিল সমস্যা পরিলক্ষিত। তাই বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পরোক্ষ গণতন্ত্রই (Indirect Democracy) প্রচলিত। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে যে দল বা কোয়ালিশন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারা সরকার গঠন করে এবং অন্য দল বা দলগুলি বিরোধী দলের ভূমিকা নেয়।

ভারতে স্বাভাবিকভাবেই পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect Democracy) প্রচলিত, কারণ ভারত বিশাল দেশ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা সমৃদ্ধ। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে যে দল বা কোয়ালিশন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তারাই সরকার গঠন করে। অন্য দল বা দলগুলি বিরোধী দলের ভূমিকা নেয়। উদাহরণস্বরূপ ২০১৯-এর নির্বাচনে কেন্দ্রে এন. ডি. এ. অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি ও সহযোগীদল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে শাসন ক্ষমতা লাভ করেছে এবং অন্য দলগুলি বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে।

তবে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের তিনটি আধুনিকরূপ গণভোট, গণ উদ্যোগ, পদচ্যুতি (Referendum, Initiative, Recall) কে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের শাসন ব্যবস্থায় এই প্রক্রিয়া স্বীকৃত। সম্প্রতি গ্রেট ব্রিটেন 'ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন' থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টি 'গণভোটের' মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করেছে যা 'Brexit' নামে পরিচিত। ভারতে অবশ্য গণতন্ত্রের আধুনিকরূপ পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য নাগরিক পঞ্জীকরণের বিষয়টি নিয়ে কোনও কোনও দল 'গণভোট' গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি স্বীকৃত হলেও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ অধিকার রক্ষাকেও গণতন্ত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতে তফশিলি জাতি, উপজাতি, নারী, শিশুদের স্বার্থরক্ষার জন্য চাকুরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সংরক্ষণের নীতিকে স্বীকার করা হয়েছিল তাহা এখনও বজায় রয়েছে। জন স্ফুয়ার্ট মিলও সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতিকে স্বীকৃতি দিয়েও সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার, দাবি দাওয়াকে মেনে নিয়েছেন।

পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচনের দ্বারা সরকার গঠিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যবস্থা রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিহার্য। এখানে দল ব্যবস্থা এক দলীয়, দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় হতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাবাদ (Democratic centration) ব্যবস্থায় একদলীয় কমিউনিস্ট দল ব্যবস্থাকেই স্বীকার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে

সেখানে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে—এবং এই দুটি দল হল— ডেমোক্রাটিক (Democratic) ও রিপাবলিকান (Republican) দল। গ্রেট ব্রিটেনে ও মূলত দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়েছে— রক্ষণশীল দল (Conservative Party) ও শ্রমিক দল (Labour Party), যদিও সাম্প্রতিককালে লিবারেল ডেমোক্রাটিক দল এবং আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল নির্বাচনে আসন লাভ করেছে। অবশ্য রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দলের মধ্যে শাসন ব্যবস্থা পরিচালন করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রয়েছে।

১.৪ ভারতের গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রকাশ ও প্রকৃতি

ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বহু দলীয় শাসন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে তাই এই দল ব্যবস্থা দুটি ভাগে বিভক্ত—জাতীয় দল ও আঞ্চলিক দল। ভারতে জাতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিগণিত হতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করতে হবে—(i) লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভায় সাধারণ নির্বাচনে আইন সঙ্গত ভোটের ৬% ভোট যেকোনও চার বা ততোধিক রাজ্যে লাভ করতে হবে (ii) এছাড়া অতিরিক্তভাবে কোনও একটি রাজ্য বা রাজ্যগুলি থেকে অন্তত ৪টি আসন লোকসভায় পেতে হবে অথবা কমপক্ষে ২% আসন লোকসভায় পেতে হবে অর্থাৎ ৫৪৩ জনের লোকসভায় ১১টি আসন লাভ করতে হবে এবং এই সদস্যপদে অন্তত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচিত হতেই হবে অথবা কোনও রাজ্যের বিধাসভায় মোট আসনের ৩% আসন লাভ করতে হবে অথবা কম পক্ষে বিধানসভায় ৩টি আসন পেতে হবে এবং এর মধ্যে যেটি বেশি হবে সেটিই গ্রাহ্য হবে।

জাতীয় দল হিসেবে স্বীকৃত দলগুলি হল—বহুজন সমাজ পার্টি (BSP), ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (CPI), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) (CPI(M)) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress), ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (NCP), সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (AITMC)।

আবার আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— আম আদমি পার্টি (AAP), আর. জে. ডি., জনতা পার্টি (RJD), অসম গণ পরিষদ (AGP), বোডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট, অল ঝাড়খন্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ডি. এম. ডি. কে, এ. আই. এ. ডি. এম. কে., ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল, ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগ, জে এন্ড কে ন্যাশনাল কনফারেন্স, জে এন্ড কে ন্যাশনাল প্যানথার পার্টি, জনতা কংগ্রেস, জে এন্ড কে পিপলস ডেমোক্রাটিক পার্টি, ছত্রিশগড় জনতা দল (সেকুলার), জনতা দল (ইউনাইটেড), ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা, ঝাড়খন্ড বিকাশ মোর্চা (প্রজাতান্ত্রিক), কেরালা কংগ্রেস, অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক, বিজু জনতাদল, মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা, মহারাষ্ট্রীয়বাদী গোমন্তক পার্টি, মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট, মিজোরাম পিপলস ফ্রন্ট, নাগা পিপলস ফ্রন্ট, আর. এস. পি., সমাজবাদী পার্টি শিরোমনি আকাল দল, শিব সেনা, তেলেগু দেশম পার্টি, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি, সিকিম ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট প্রভৃতি।

চতুর্থত : গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার পার্লামেন্টীয় (Parliamentary) বা সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত (Residential) এবং এককেন্দ্রিক (Unitary) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় (Fedral) হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ গ্রেট ব্রিটেন পার্লামেন্টিয় ও এককেন্দ্রিক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি শাসিত এবং যুক্তরাষ্ট্রীয়। ভারতে ব্রিটেনের অনুসরণে পার্লামেন্টিয় বা সংসদীয় সরকার গঠিত হয়েছে। পার্লামেন্টিয় ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের কাছে সরকার দায়িত্বশীল এবং পার্লামেন্টে সরকারের বিরুদ্ধে যদি অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয় তাহলে সরকারকে পদত্যাগ করতেই হয়। আবার পার্লামেন্টিয় শাসন ব্যবস্থার রাষ্ট্র প্রধান সাংবিধানিক প্রধান (Offereal/Constitutional Head) হিসেবে গণ্য হন—যেমন ভারতে রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান বা শাসক (Dejure head) এবং প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা আসল শাসক (Refacto hgead)। মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে চলতে

হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি আসল শাসক, যদিও কংগ্রেস বা কেন্দ্রীয় আইনসভা অনাস্থা বা ইমপিচমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে।

এককেন্দ্রিক (unitary) শাসন ব্যবস্থার দেশে একটি সরকার শাসন ব্যবস্থা পরিচলিত করে তবে সরকার প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষমতা স্থানীয়স্তরে হস্তান্তরিত করতে পারে, যদিও চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারেই ন্যস্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়।

ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুধরনের শাসক যা—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও বর্তমানে ২৮টি রাজ্য সরকার রয়েছে, এবং সম্প্রতি জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখকে নিয়ে ৯টি কেন্দ্রশাসিত (Union Territory) অঞ্চল রয়েছে যথা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চন্ডীগড়, দাদরা এবং নগরহাভেলি, দমন এবং দিউ, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি, জম্মু এবং কাশ্মীর, লাক্ষাদ্বীপ, লাদাক ও পুদুচেরি (পন্ডিচেরি)।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তিনটি তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন করা হয়েছে—কেন্দ্রীয় তালিকা অথবা union list (প্রথম ৯৭টি বিষয়, বর্তমানে ৯৬টি) এই বিষয়গুলি উপর কেবল পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করার অধিকারী। রাজ্য তালিকা অথবা state list (প্রাথমিকভাবে ৬৬টি, বর্তমানে ৬১টি) ভুক্ত বিষয় রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়নের অধিকারী। যুগ্ম তালিকা অথবা concurrent list (৫২টি বিষয়) ভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে, তবে কেন্দ্র ও রাজ্য আইনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ওই যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ থাকবে।

আবার গণতান্ত্রিক ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়করণের প্রবণতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয় তাই কে. সি. হোয়ার (K. C. Wheare) প্রমুখ লেখকগণ ভারতকে আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় (Quasi-federal) বলে মন্তব্য করেছেন। এই কেন্দ্রীয়করণের ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ৩৫২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। ১৯৬২তে ভারত-চিন সংঘর্ষ, ১৯৬৫ ও ১৯৭১-এ ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময় এই জাতীয় জরুরি অবস্থা (National Emergency) ঘোষিত হয়েছিল। ৩৫৬নং ধারা অনুযায়ী কোনও রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক (President's Rule) অচলাবস্থার কারণে জরুরি অনাস্থা ঘোষণা করতে পারেন। ভারতের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই একাধিকবার এই শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছে? ৩৬০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরি অবস্থা দেশে ঘোষণা করতে পারেন (Financial Emergency), তবে আজ পর্যন্ত এই আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয় নি।

তবে রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কাছে সাহায্য প্রার্থী হতেই হয়। ফিনান্স বা অর্থ কমিশন, নীতি অয়োগ প্রভৃতির রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তা ও সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতির কারণেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

গণতন্ত্রে 'আইনের অনুশাসন' (Rule of Law) যা এ. ভি. ডাইসি (A. V. Dicey) সূচনা করে দিয়েছেন তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 'আইনের অনুশাসনে' বলা হয় কেউ আইনের উর্দ্ধে নয়। সবাইকে সাধারণ আইনের দ্বারা সাধারণ আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। এখানে কোনও বৈষম্য থাকবে না। ভারতেও এই আইনের অনুশাসনকে স্বীকার করা হয়েছে, তবে শিশু বা নাবালকদের জন্য স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে, এবং রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কর্তব্যরত অবস্থায় ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে এবং বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাস কর্মীদের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

গণতন্ত্রে নির্বাচন কমিশন বা অনুরূপ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ভোট ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার গঠিত করার দায়িত্ব পালন করা হয়। ভারতেও সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশন গঠন করেন; কেন্দ্রে ও রাজ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অথবা আইনসভায় আসন শূন্য হলে বা কোনও সরকারের পতন ঘটলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালিত করে। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ বছর বয়স হলে ভারতে নাগিরকগণ ভোটাধিকারের অধিকারী হন। নির্বাচন হয় স্বাধীন ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে। লোকসভা ও বিধানসভার সদস্য হলে নূন্যতম ২৫ বছর এবং রাজ্যসভা ও বিধানপরিষদে সদস্য হলে নূন্যতম ৩০ বছর প্রার্থীকে হতে হবে।

গণতন্ত্র সম্মতির সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল, শক্তি বা দমনের উপর নয়; কথাবার্তা, বিতর্ক এবং আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে। সংখ্যালঘুর ন্যায্য দাবিগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। বস্তুত গণতন্ত্র স্বাধীন মুক্ত সমাজকে সূচিত করে। গণতন্ত্রে সরকারের প্রতিটি কাজ সুস্থ জনমতের উপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র হল একটি কল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থা।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও একটি ঐক্যবদ্ধ ও সংহতিসূচক (United and integreted) শাসন ব্যবস্থার উপর এবং সৌভ্রাতৃত্বের (Fraternity) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেমন সরকর গঠন করবে তেমনি সংখ্যালঘুরা দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সংখ্যালঘুরা গণতন্ত্রে নাগরিকদের বাকস্বাধীনতা রয়েছে এবং মতামত প্রকাশের ও তথ্য জানার অধিকার রয়েছে। তাদের কোনও প্রতিষ্ঠান গঠন করা, কোনও প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া এবং তা ত্যাগ করার অধিকারও রয়েছে। ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে ১৯নং অনুচ্ছেদে স্বাধীনতা অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যেখানে বাক স্বাধীনতা, সংগঠন করা, সমবেত হওয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে।

গণতন্ত্রে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের অনৈতিক আধিপত্য থেকে মুক্ত রাখার কথা বলা হয়। ভারতেও বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে (Independance of the judiciary) গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের নিয়োগ, কার্যকলাপ যুক্তিসংগত ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয়। ভারতে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচাপতিদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। কিন্তু বিচারপতিদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কলেজিয়াম গঠন করা হয়েছে এবং এই কলেজিয়াম বিচারপতিপদে নাম সুপারিশ করে এবং রাষ্ট্রপতি সেই অনুযায়ী বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। বিচারপতিরা যাতে নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করেন এবং দুর্নীতিমুক্ত হন সেদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গণতন্ত্র শুধুমাত্র একটি সরকারের রাজনৈতিক কাঠামোর বা কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বস্তুত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তাকেও গণতন্ত্রে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়, একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও তার শ্রদ্ধামূলক পারস্পরিকতার উপরও গণতন্ত্র সমান গুরুত্ব আরোপ করে। এককথায় গণতন্ত্র শুধু একটি শাসন ব্যবস্থা নয়। এটি হল সভ্য জীবনযাপনের প্রতীক। যেখানে বিবিধের মাঝে মহান মিলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণও মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমে গণতন্ত্রের সামগ্রিক রূপটির উপর জোর দিয়েছেন।

১.৫ ভারতে গণতন্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ

গণতন্ত্রে অর্থ, প্রকৃতি ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখের পর ভারতে এই গণতন্ত্রের বাস্তব প্রয়োগের দিকটিও আমরা মূল্যায়ন করতে প্রয়াসী হব—

সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে আমরা ভারতের জনগণ ভারতীয় একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে গঠন করতে, পবিত্রভাবে মনস্থ করেছি। অর্থাৎ এর দ্বারা জনগণকেই সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচয় হিসেবে গণ্য করা হয় যা গণতান্ত্রিক। প্রসঙ্গত ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 'সমাজতান্ত্রিক' (socialist), ধর্মনিরপেক্ষ (secular) এবং 'সংহতি' (integrity) শব্দ তিনটি প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

'সার্বভৌম' (sovereign) শব্দটির অর্থ হল ভারত আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। সমাজতান্ত্রিক (socialist) ধারণাটিতে ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে যেখানে শ্রেণীসংগ্রাম বিপ্লবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সেখানে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শকে সামনে রেখে শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়। 'ধর্মনিরপেক্ষ' (secular) শব্দটির দ্বারা বলা হয়েছে ভারত রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনও ধর্ম থাকবে না। ধর্ম হল ব্যক্তিগত বিষয়, 'ধৃ' ধাতুর অর্থ হল ধারণ করা তাই কোনও ধর্ম কখনই ধ্বংসের কথা বলে না, সর্বধর্মই পরাজয়কে শ্রদ্ধাসহ স্বীকার করে। যথার্থ গণতন্ত্রের ধর্ম ও মানবতাবাদ সমার্থক। ধর্মের নামে যখন কোনও আইন শৃঙ্খলাভঙ্গ হয় তখন কেবল রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে এবং আইনশৃঙ্খলা স্থিতিশীল হলে পুলিশ বা সেনাবাহিনী নিজ নিজ ব্যারাকে ফিরে যায়। 'গণতান্ত্রিক' (democratic) শব্দটির অর্থ হল জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে এবং জনগন ও রাজনৈতিক দলগুলির গঠনমূলক মতবাদের সহাবস্থান স্বীকৃত হয়।

'প্রজাতান্ত্রিক' (Republic) শব্দটির অর্থ হল এখানে রাজার বা রানীর কোনও স্থান নেই বা এখানে পুরুষানুক্রমে কোনও শাসক থাকে না। পক্ষান্তরে নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠিত হয়। প্রস্তাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়ের (Justice) কথা বলা হয়েছে যা গণতন্ত্রের সহায়ক আবার চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে স্বাধীনতাও (Liberty) গণতন্ত্রের পরিপূরক। পদমর্যাদা ও সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা (equality) এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ (fraternity), ঐক্য ও সংহতি (unity and integrity) যা প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে তা গণতান্ত্রিক মতাদর্শের পরিপূরক।

(খ) সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে সাম্যের অধিকার স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অধিকার, সংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার গণতান্ত্রিক আদর্শগুলিকেই সমৃদ্ধ করে তোলে।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের অধিকার (Abolition of ...chability—article 17) যা সংবিধানে সাম্যের অধিকারের সঙ্গে বলা হয়েছে তাতে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার একটি দীর্ঘ দিনের কলুষতাকে নির্মূল করার কথাই বলা হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে তা গণতান্ত্রিক। প্রসঙ্গত নারী, শিশু, তফশিলি জাতি, উপজাতি, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রদূত বা বিদেশি দূতাবাসের কর্মচারিদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ও সুবিধার কথা হলা হলেও মূলত অধিকারগুলি গণতন্ত্রের সহায়ক।

(গ) আবার সংবিধানে মৌলিক অধিকারের বা (Fundamental Rights)-এর সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য বা Fundamental Duties পালনের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে ১১টি কর্তব্যের উল্লেখ সংবিধানে রয়েছে। অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিতা গণতন্ত্রের আদর্শকেই শক্তিশালী করে তোলে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কর্তব্যগুলি ৫১(ক) অনুচ্ছেদে সংযোজিত করা হয়। ২০০২ সালে ৮৬তম সংবিধান সংশোধন মারফৎ ১১নং কর্তব্যটি সংযোজিত করা হয়। গণতন্ত্রের আদর্শের পরিপূরক এই কর্তব্যগুলি হল (১) সংবিধান মেনে চলা এবং তার সকল আদর্শ ও সংস্থা, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে শ্রদ্ধা করা (২) যে মহান আদর্শ স্বাধীনতার জন্য আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হৃদয়ে পোষণ করা ও তা অনুসরণ করা (৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব ঐক্য ও অখন্ডতাকে রক্ষা করা (৪) দেশরক্ষা করা (৫) ভারতের সকল মানুষের মধ্যে সাধারণ ভ্রাতৃত্বভাব বৃদ্ধি করা (৬) আমাদের বিমিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য রক্ষা করা (৭) প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা ও তার উন্নতি সাধন করা (৮) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও অনুসন্ধিৎসা গড়ে তোলা (৯) সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা (১০) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্যকলাপের সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভের জন্য চেষ্টা করা। (১১) পিতা মাতার মৌলিক কর্তব্য হল সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানো।

(ঘ) সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশমূলক নীতির (Directive Principles of State Policy) মাধ্যমে রাজনৈতিক ও আইনসঙ্গত অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের পালনীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্তব্যগুলি ও নীতিসমূহ পালনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ৩৬-৫১ অনুচ্ছেদের মধ্যে এই নির্দেশমূলক নীতিগুলি উল্লেখিত হয়েছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে, প্রশাসন আর বিধিপ্রণয়ন উভয় ব্যাপারেই এই নীতিগুলি অনুসরণ করা। এই নীতিগুলির ভিতরে গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের যে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেই উদ্দেশ্যগুলি নিহিত আছে, অর্থাৎ কল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে অধিকাংশ নীতির লক্ষ্য হল সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রতিশ্রুত আর্থিক ও সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আলোচনার সুবিধার জন্য সরকারেও পালনীয় নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়— (i) সমাজতান্ত্রিক, (ii) গান্ধীবাদী এবং (iii) উদারনৈতিক (liberal)।

সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলি : (i) রাষ্ট্র সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণ এবং যোগানের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে প্রয়াসী হবে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় সূচিতে করবে (৩৮ নং অনুচ্ছেদ), (ii) এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জীবনযাত্রা সংরক্ষণে যথাযথ সহায়তা করবে, দেশের অর্থনৈতিক সম্পদকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে যাতে সকলের সাধারণ কল্যাণ সূচিত হয়, আবার যাতে কয়েক জনের সম্পদ সীমিত না থাকে, কারণ এর ফলে জনগণের কল্যাণ ব্যাহত হয়। সম কাজে পুরুষ এবং নারী উভয়কেই সমান বেতন সুনিশ্চিত করা হবে, সমস্ত ক্ষেত্রে সব বয়সের স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখা হবে, শিশুদের স্বাস্থ্যকর উন্নয়ন ঘটানো হবে এবং শিশু ও তরুণদের শোষণ থেকে রক্ষা করা হবে। (৩৯নং অনুচ্ছেদে) (iii) বিধান সংশোধনের মাধ্যমে বলা হয়েছে রাষ্ট্র ন্যায়ের (justice) ক্ষেত্রে জনগণকে সমান সুযোগ দেবে এবং বিনা ব্যয়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করবে (৩৯ক)। (iv) রাষ্ট্র জনগণকে কাজের, শিক্ষার অধিকার প্রদান করবে এবং বেকারত্ব, বৃদ্ধাবস্থা, অসুস্থতা, অক্ষমতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য দেবে। (৪১নং অনুচ্ছেদে) (v) রাষ্ট্র কাজের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক পরিবেশ প্রদান করবে এবং মাতৃত্বের ক্ষেত্রে সহায়তা দেবে। (৪২নং অনুচ্ছেদ) (vi) শিল্প, কৃষি বা অন্য যেকোনও কাজের ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রমিকদের জীবনধারনের উপযোগী মজুরি রাষ্ট্র প্রদান করবে কাজের পরিবেশ, সুন্দর জীবনযাপনের মান, অবসর এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সুবিধাদি রাষ্ট্র প্রদান করবে। (৪৩নং অনুচ্ছেদ) (vii) ৪২তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী রাষ্ট্র শিল্পগুলির পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ ব্যবস্থাকে উপযুক্ত সহায়তা দেবে। (৪৩ক অনুচ্ছেদ) (viii) রাষ্ট্র ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। (৪৫নং অনুচ্ছেদ) (ix) দুর্বল শ্রেণীর, বিশেষ করে তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতিদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং তাদের সমস্ত রকম সামাজিক অন্যায় এবং সমস্ত রকম শোষণ থেকে রক্ষা করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। (৪৬নং অনুচ্ছেদ) (x) পুষ্টির স্তরের উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান এবং জনস্বাস্থ্যের বিকাশের উন্নয়নের দিকটি রাষ্ট্র গুরুত্ব দেবে (৪৭নং অনুচ্ছেদ)।

গান্ধীবাদী নীতিগুলি : গান্ধীর নীতিগুলির অনুসরণে রাষ্ট্রের যে, সমস্ত নীতিগুলি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে তাহল (i) রাষ্ট্র গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলবে (৪০নং অনুচ্ছেদ), (ii) গ্রামীণ কুটির শিল্পগুলিকে উন্নত করবে (৪৩নং অনুচ্ছেদ), (iii) তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি এবং জনসংখ্যার অন্যান্য দুর্বলশ্রেণীর মানুষদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নতিতে রাষ্ট্র সক্রিয় হবে (৪৬নং অনুচ্ছেদ), (iv) রাষ্ট্র মদ এবং ড্রাগ বা নেশাকে নিষিদ্ধ করবে (৪৭নং অনুচ্ছেদ), রাষ্ট্র প্রাণী সম্পদকে রক্ষা করবে এবং গো হত্যাকে বাতিল করবে।

উদারনৈতিক নীতিগুলি (Liberal Principle) : (i) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক নীতিগুলি রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয় যাতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (uniform civil code) দেশে চালু হয়। (৪৪নং অনুচ্ছেদ), (ii) কৃষি ও পশু পালন বিষয়টিকে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে হবে (৪৮নং অনুচ্ছেদ) (iii) পরিবেশের উন্নতি সাধন (৪৮নং অনুচ্ছেদ)

(iv) ঐতিহাসিক সৌধ সংরক্ষণ এবং কলা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন (৪৯নং অনুচ্ছেদ); (v) শাসনবিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র করা (৫০ অনুচ্ছেদ); বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক আইন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতিগুলি অনুসরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিবাদগুলি সমাধান করতে প্রয়াসী হওয়া।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি বিচারযোগ্য নয়, অর্থাৎ রাষ্ট্র এগুলি পূরণে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যায় না, তবে সরকার বিভিন্ন সময়ে এক বেশ কিছু নীতি রূপায়ণে সচেষ্ট হয়েছে যা গণতন্ত্রের সহায়ক। উপরন্তু জনগণের সরকারের প্রতি আচরণ ওই নির্দেশগুলি কতটা সরকার রূপায়ণ করেছে তার উপরও নির্ভর করে।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিহার্য এবং ভারতে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিবেচ্য। প্রসঙ্গত যেহেতু ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাই জাতীয় দল ও আঞ্চলিক দল হিসেবে তাদের প্রাধান্য গণতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আমরা প্রথমে উল্লেখ করতে পারি। স্বাধীনতা পাওয়ার পর কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫১-র পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং ১৫ই এপ্রিল ১৯৫২ থেকে মে ১৯৬৪ পর্যন্ত আমৃত্যু জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কংগ্রেস-ই গুলজারিলাল নন্দ অন্তবর্তীকালীন ২৭মে, ১৯৬৪ থেকে ৯ই জুন ১৯৬৪ ১৩দিন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে। এরপর লালবাহাদুর শাস্ত্রী জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে ৯ই জুন ১৯৬৪ থেকে ১১ই জানুয়ারি ১৯৬৬ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকেন। আবার জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গুলজারিলাল নন্দ ১১ই জানুয়ারি ১৯৬৬ থেকে ২৪শে জানুয়ারি ১৯৬৬ মাত্র ১৩ দিনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর কংগ্রেস সভাপতি কে. কামুরাজের উদ্যোগে জওহরলাল নেহেরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ২৪শে জানুয়ারি ১৯৬৬ থেকে ২৪শে মার্চ ১৯৭৭ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

এরপর মোরারজি দেশাই জনতা দল থেকে ২৪শে মার্চ ১৯৭৭ থেকে ২৮ শে জুলাই ১৯৭৯ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এরপর জনতা দল (সেকুলার), কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে এবং জনতা দল নেতা চরণসিং মোরারজি দেশাইয়ের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২৮শে জুলাই ১৯৭৯ থেকে ১৪ই জানুয়ারি ১৯৮০ পর্যন্ত। এরপর আবার কংগ্রেস (আই)-এর ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮০-র ১৪ জানুয়ারি থেকে ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৪ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। ইন্দিরা গান্ধী ৩১শে অক্টোবর রক্ষীর হাতে নিহত হলে, পুত্র রাজীব গান্ধী প্রথমে ৩১শে অক্টোবর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৪, এবং পরে সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ২রা ডিসেম্বর ১৯৮৯ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকেন।

পরবর্তী নবম সাধারণ নির্বাচনে কোনও দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কটরমন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলের নেতা রাজীব গান্ধীকে সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু রাজীব গান্ধী বোফর্স কামান সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগকে নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করে ওই প্রস্তাব থেকে সরে আসেন। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বি. জে. পি দলও সরকার গঠনে রাজি হয় না। পরে জনতা দল (ন্যাশনাল ফ্রন্ট)-এর নেতা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং বি. জে. পি-র বাইরে থেকে সমর্থনের ফলে প্রধানমন্ত্রীরূপে রাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কটরমন কর্তৃক নিযুক্ত হন। পরে বি. জে. পি.র রথযাত্রা নিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার অনুমতি না দিলে বি. জে. পি. প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর উপর থেকে সমর্থন তুলে নেয়। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং নিজে থেকে পদত্যাগ না করে লোকসভায় অনাস্থা ভোট গ্রহণে উদ্যোগী হন এবং স্বাভাবিকভাবেই পরাজিত হন। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ২রা ডিসেম্বর, ১৯৮৯ থেকে ১০ই নভেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন থাকেন।

এরপর জনতা দল থেকে চন্দ্রশেখর বেরিয়ে আসেন কিছু অনুগামী নিয়ে এবং সমাজবাদী জনতা দল গঠন করেন। এই সময় কংগ্রেস (আই) সাধারণ নির্বাচন বিলম্বিত করার তাগিদে চন্দ্রশেখরকে বাইরে থেকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে এবং রাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কটরমন চন্দ্রশেখরকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। চন্দ্রশেখর ১০ই নভেম্বর ১৯৯০ থেকে ২১শে জুন, ১৯৯১ প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন থাকেন। কারণ ৬ই মার্চ, ১৯৯১ কংগ্রেস (আই) সমর্থন তুলে নেয় এবং এর ফলে চন্দ্রশেখর সরকার পূর্ণ বাজেট পেশ করতে সক্ষম হয় না। এই সমর্থন তুলে নেওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয় রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে যে গোপনে আড়িপাতা হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে চন্দ্রশেখর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে তৎপর হননি। চন্দ্রশেখর উপযুক্ত তদন্ত ও তার ফলাফল জানার জন্য সময় চেয়েছিলেন।

এরপর দশম সাধারণ নির্বাচনেও কোনও দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না এবং জাতীয় কংগ্রেস (ই) আবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই সময় বামপন্থী দলগুলি জাতীয় কংগ্রেস (ই)-র পার্লামেন্টারিয় নেতা পি. ভি. নরসিংহ রাওকে সরকার গঠনে অনুরোধ জানায় এবং বাইরে থেকে তাদের সমর্থনের কথা বলে। রাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কটরমন নরসিংহ রাওকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। দশম সাধারণ নির্বাচনের সময়ে পাঞ্জাবে শান্তি শৃঙ্খলার অবনতির কারণে নির্বাচন সম্ভব হয় না। পরে নির্বাচন হলে কংগ্রেস (আই) ১২টি আসন লাভ করে। আবার অজিত সিং-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রীক দলের ১/৩ অংশ লোকসভার সদস্য অর্থাৎ ৭জন নরসিংহ সরকারে যোগ দেয়। এর ফলে নরসিংহ সরকার স্থিতিশীলতা লাভ করে। ২১শে জুন ১৯৯১ থেকে ১৬ই মে ১৯৯৬ নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রী থাকেন। একাদশ সাধারণ নির্বাচনের পর কোনও দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না। ভারতীয় জনতা পার্টির পার্লামেন্টীয় নেতা অটল বিহারি বাজপেয়ীকে রাষ্ট্রপতি শংকর দয়াল শর্মা প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন ও অটল বিহারি বাজপেয়ী মাত্র ১৬দিন প্রধানমন্ত্রী থাকেন (১৬ই মে ১৯৯৬ থেকে ১লা জুন ১৯৯৬) এবং নিজে থেকে পদত্যাগ করেন।

এরপর জনতা দলের (ইউনাইটেড ফ্রন্ট) রাজ্যসভার সদস্য এইচ. ডি দেবগৌড়াকে রাষ্ট্রপতি শংকর দয়াল শর্মা প্রধানমন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। ১লা জুন ১৯৯৬ থেকে ২১ এপ্রিল ১৯৯৭ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় থাকেন এবং এরপর পদত্যাগ করেন। এরপর জনতা দলের (যুক্তফ্রন্টে) বিহারের রাজ্যসভার সদস্য ইন্দরকুমার গুজরালকে প্রধানমন্ত্রী পদে রাষ্ট্রপতি শংকর দয়াল শর্মা নিযুক্ত করেন। ২১শে এপ্রিল ১৯৯৭ থেকে ১৯ই মার্চ, ১৯৯৮ ইন্দরকুমার গুজরাল ক্ষমতায় আসীন ছিলেন।

এরপর এন. ডি.-এর (National Democratic Alliance) অন্তর্ভুক্ত বি. জে. পি-র অটল বিহারি বাজপেয়ীকে রাষ্ট্রপতি কে. আর নারায়ণ (K. R. Narayanan) প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন এবং অটল বিহারি বাজপেয়ী ১৯শে মার্চ, ১৯৯৮ থেকে ১০ই অক্টোবর ১৯৯৯ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসীন থাকেন। পরে আবার ১০ই অক্টোবর ১৯৯৯ থেকে ২২শে আগস্ট ২০০৪ তিনি পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন।

এরপর UPA (United Progressive Alliance)-এর অন্তর্ভুক্ত প্রধানমন্ত্রী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ডঃ মনমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রী পদে রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আবদুল কালাম নিযুক্ত করেন। ডঃ মনমোহন সিং দু দফায় ২২শে আগস্ট ২০০৪ থেকে ২২শে আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত প্রধনমন্ত্রী পদে নিযুক্ত থাকেন। এরপর এন. ডি.-এর অন্তর্ভুক্ত প্রধান দল বি. জে. পি-র নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রীপদে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ২৬শে আগস্ট ২০১৪-তে নিযুক্ত করেন এবং ২০১৯-এর ২৯শে আগস্ট নরেন্দ্র মোদী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত ওই পদে রয়েছেন।

কেন্দ্রে যে দল বা গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন ছিল বা রয়েছে, অনেক সময় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ভিন্নদল বা কোয়ালিশন ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত কংগ্রেস দল ক্ষমতাসীন থাকে। পরে ১৯৭৭ থেকে ১৩ই মে ২০১১ পর্যন্ত বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন থাকে, ২০১১ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন রয়েছে। ওড়িষায় বিজু

জনতা দল, বিহারে আর. জে. ডি দল, কেরালাতে কমিউনিস্ট দল, উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে বি.জে.পি ক্ষমতাসীন। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কোথাও কোথাও কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল রয়েছে, আবার অন্য রাজনৈতিক দল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছে। সাধারণভাবে যদি কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দল ক্ষমতাসীন থাকে তাহলে ওই রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত মসৃণ থাকে, পক্ষান্তরে কেন্দ্রে ও রাজ্যে যদি ভিন্ন ভিন্ন দল ক্ষমতায় থাকে তাহলে কেন্দ্র ও ওই রাজ্যে শাসন ব্যবস্থায় অনেক সময় বিরোধ দানা বাঁধে। উদাহরণ স্বরূপ বর্তমানে নাগরিক পঞ্জী নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি প্রভাবিত এন. ডি. এর সঙ্গে অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে (২০১৯ ডিসেম্বর-২০২০ জানুয়ারি)।

গণতন্ত্রে বিকেন্দ্রিকরণ ব্যবস্থা রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ভারতে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে এই বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সফল করে তুলেছে।

জওহরলাল নেহেরুর মতে ''স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা অবশ্যই যথার্থ গণতন্ত্রের ভিত্তি। আমরা গণতন্ত্রকে যতটা উপর দিক থেকে দেখি ততটা নিচের থেকে দেখি না। উপর থেকে দেখা গণতন্ত্র সফল হতে পারে না, যদি না তা নীচ থেকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।" (Local self government must be the basis of any true system of democracy. We have got rather into the habit of thinking of democracy at the top and not so much below. Democracy at the top will not be a success unless it is built on the foundation from below-Jawharlal Nehru)

১৯৯২ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে গোটা ভারতে একই প্রকারের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তিনটি স্তরে গঠনের কথা বলা হয়েছে সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এর উপরের সংস্থাটি হল একাধিক পঞ্চায়েত সমিতি কতকগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একেকটি পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হবে, এবং কয়েকটি পঞ্চায়েত সমিতি নিয়ে জেলা পরিষদ সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে প্রতিটি জেলায় গঠিত হবে। এছাড়া প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম সভা গঠিত হবে। এই গ্রাম সভা গ্রামের সব প্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়ে গঠিত হবে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তিনটি স্তরই প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে। এই তিনটি স্তরেই ১/৩ অংশ সদস্য মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং এই সংরক্ষিত মহিলা আসনের মধ্যে তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতির মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত।

৭৪তম সংবিধান সংশোধন ১৯৯২ অনুসারে ছোট শহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি এবং বড় শহরে কর্পোরেশন গঠিত হবে। এখানেও অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরশেনেও ১/৩ অংশ সদস্য মহিলা হবে, আবার প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড কমিটি থাকবে যা ওয়ার্ডের বিভিন্ন পেশাভুক্ত মানুষদের নিয়ে গঠিত হবে যাতে ওয়ার্ডের উন্নতির ক্ষেত্রে জনগণের মতামত গ্রহণ করার মাধ্যমে যথার্থ অগ্রগতি সম্ভব হয়। এই ৭৪তম সংবিধান সংশোধন ১লা জুন, ১৯৯৩ এ কার্যকরি হয়। পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটি/কর্পোরেশন তাদের নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা যেমন করবে তেমনি সরকারি অনুদানও প্রদান করা হবে।

১.৬ ভারতের গণতন্ত্রের বিকাশের পথে বাধার সমূহগুলি

ভারতে গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রকৃতি ও আলোচনার পর আমরা গণতন্ত্রের যথার্থ বিকাশের পথে যে সমস্ত বাধা দেখা গিয়েছে সেগুলি আলোচনা করব এবং সেই সব বাধাগুলি উত্তরণের প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন যাতে ভারত যথার্থ গণতন্ত্রের

স্বরূপ স্বমহিমায় নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতাগুলি হল নিম্নরূপে—

(১) জাতপাত : জাতপাত হল একটি নৃতাত্ত্বিক বিষয় যা মানবজাতির জীবনে সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে কিন্তু সেই জাতপাত যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজ নিজ জাতপাতের আধিক্য অনৈতিকভাবে জাহির করতে সচেষ্ট হয় তা ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। জয় প্রকাশ নারায়ণ একদা বলেছিলেন জাত ব্যবস্থা ভারতে রাজনৈতিক দলের প্রধান ভূমিকায় পরিণত হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকে একজন ভারতীয় নাগরিক একটি জাতের উত্তরাধিকারী হয় এবং একটি বিশেষ জাত গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে বড় হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে বলা হয় একজন নাগরিক হয় উচ্চ জাতভুক্ত (high caste) অথবা নিম্নজাতভুক্ত বা তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিভুক্ত (scheduled caste and scheduled tribe)। এর ফলে অনেক সময় এই উচ্চ-নীচ জাতপাতের প্রভাব সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এবং কালক্রমে রাজনৈতিক চিন্তা, ধারণা ও অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়।

এই জাত সচেতনতার নিজস্ব গুরুত্ব নৃতত্ত্বে থাকলেও তাকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। যেমন—i) সমাজে বিভিন্ন জাতি রাজনীতিতে আধিপত্য ও নেতৃত্ব অর্জনে সক্রিয় হয়েছে। হরিয়ানা, বিহার, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, এই জাত সচেতনতার আধিপত্য দেখা যায়। হরিয়ানাতে 'বিশনয়' (Bishnois) বা ব্রাহ্মণদের ও অন্ধ্রপ্রদেশে রেড্ডি বা 'কাম্মা (Kamma) এবং ভালামাস (valamas) জাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অর্জনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। (ii) ভারতের দল ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতগোষ্ঠী রাজনৈতিক দলের উপর নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপনে সক্রিয়। বস্তুতপক্ষে ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যেই নির্বাচনে প্রাধান্যকারী জাতের প্রতিনিধি স্থির করা এবং সেই প্রার্থীর অনুকূলে ভোট দেওয়ার প্রবণতা প্রকট। এইভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জাতপাতের প্রভাব খাটিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করতে সচেষ্ট হয়। আবার জাতপাতের মধ্যে সমাজে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটে।

ভারতের সংবিধানের ৩৩০-৩৩২ অনুচ্ছেদে তফশিলি ও তফশিলি উপজাতিদের কেন্দ্রীয় আইনসভায় এবং বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে আবার সরকারি অফিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে, ৩৩১ এবং ৩৩৩ অনুচ্ছেদে। লোকসভায় ও রাজ্য আইনসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indian) সম্প্রদায় থেকেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবে সাম্প্রতিক কালে (২০২০ জানুয়ারি) এই ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ব্যবস্থা রদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই জাতপাত প্রসঙ্গে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে গণতন্ত্র ও সঙ্কীর্ণ জাতপাতবাদ ও অবাঞ্ছিত সংরক্ষণ একে অপরের বিপরীত। নৃতত্ত্বের দিক থেকে সুস্থ জাতীয়তাবাদকে স্বীকৃত করা গেলেও শুধুমাত্র তফশিলি জাতি ও উপজাতি হলেই সংরক্ষণ কাম্য। বস্তুতপক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকেই কেবলমাত্র যারা দারিদ্র সীমার নিচে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সংরক্ষণের দিকটি বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যেও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকে সচ্ছল হয়েছে এবং যারা তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত নন তাদের মধ্যে অনেকেও গরিব রয়েছে। অর্থাৎ দারিদ্র্য সীমার নিচে সব মানুষকেই জাতপাত ভেদে সংরক্ষণ যোগ্যতার সঙ্গে সমঝোতা না করে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(২) সাম্প্রদায়িকতাবাদ : 'সম্প্রদায়' (Community) শব্দটি শব্দগত দিক থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের জীবনধারাকে সূচিত করে। কিন্তু বাস্তবে 'সাম্প্রদায়িকতা' বাদ শব্দটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা, দ্বন্দ্ব, সংঘাতকেই বোঝানো হয় যা স্বাভাবিকভাবেই দেশের অখন্ডতা ও সংহতিকে ব্যাহত করে। বস্তুতপক্ষে ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান জনসংখ্যা লেনদেনের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যাপক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মৃতু ঘটে। ১৯৭১ সালে ভারত-পাক দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে পূর্বপাকিস্তানের

অবসান ঘটে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই পটভূমিতে ৩ মিলিয়ন মানুষ হাঙ্গামার শিকার হয়। ৮ মিলিয়ন হিন্দুদের নির্বাসন ঘটে। ১৯৮৪ সালে ৩১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিজের শিখ রক্ষকের হাতে দুঃখজনকভাবে মৃত্যু ঘটলে শিখ বিরোধী আন্দোলনে বহু সাধারণ শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের মৃত্যু ঘটে। ১৯৯২-এ বোম্বেতে যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দেয় সেখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ২০০,০০০ লোক শহর ছেড়ে বা বাড়ি ছেড়ে পলায়ন করে এবং এই সংঘর্ষে ৯০০ থেকে ৩০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটে। ১৯৯২-র ডিসেম্বরে সংঘ পরিবারের দ্বারা অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার ফলশ্রুতিতে ভারতের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটে। ১৯৯৮-র ২৫শে জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরে ওয়ানধামা (Wandhama) শহরে ২৩ জন কাশ্মীরি পন্ডিতকে হত্যা করা হয়। একটি হিন্দু মন্দির কে ধ্বংস করা হয়। ২০০২-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি গোধরায় রেল স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগানোর ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৫৯জন মানুষ মারা যান এবং ৪৮ জন আহত হন। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে গুজরাটে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ দাঙ্গায় মারা যান।

আবার সম্প্রদায়ের নিজস্ব গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও সংঘর্ষ দেখা দেয়। যেমন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিয়া-সুন্নী বিরোধ, পাঞ্জাবে শিখ-নিরাকারীদের বিরোধ, সিকিমে লেপচা ভুটিয়াদের বিরোধ উল্লেখ্য। আবার উপজাতি এবং অ-উপজাতিদের মধ্যে যেমন নাগা-কুকিদের মধ্যে সংঘাত দেখা যায়। অনুরূপভাবে মেঘালয়, মনিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং অসমেও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা যায়। সাম্প্রদায়িকতার পিছনে যে সমস্ত কারণগুলি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল—ধমীয় গোঁড়ামি : কোনও ধর্ম কখনও খারাপ হতে পারে না, 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ করা—যথার্থ ধর্ম তাই পরস্পরকে শ্রদ্ধাসহ স্বীকার করে, ধর্ম হল মানবতাবাদের স্বরূপ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় 'ধর্ম'কে বিকৃতভাবে দেখার প্রবণতা বিভিন্ন ধর্মের অনুগামী একশ্রেণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এবং এর ফলে বিভিন্ন সংকীর্ণমনা ধর্মের অনুগামীরা পরস্পরের সঙ্গে সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। খ্রিস্টান ধর্ম যাজক এবং খ্রিস্ট ধর্মের অনুগামীরা অনেক ক্ষেত্রে অন্য ধর্ম থেকে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে প্রণোদিত করে। বস্তুত হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে অবহেলিত তারা খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে উৎসাহী হয়। স্বাভাবিকভাবেই যথার্থ গণতন্ত্রে ধর্মের নামে অধর্মীয় কাজকে বরদাস্ত করা হয় না। তাই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদের অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দূর করার জন্য—

(i) যথোপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন যেখানে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদকে দূর করা যায়।

(ii) মানুষদের মধ্যে ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে যাতে নাগরিকরা একত্রে সংসারে, স্কুল, কলেজে সহযোগী গোষ্ঠী এবং সামাজিক সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলে।

(iii) গণসংযোগ ও সংবাদ মাধ্যমকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে জনগণের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় সহনশীলতা এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে।

(iv) দারিদ্র এবং অনুন্নত অবস্থাকে দূরীকৃত করতে হবে যাতে উচ্চবর্ণ ও ধনীরা নিম্নবর্ণ ও গরীবদের উপর অন্যায় আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে।

(v) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন. এস. এস, স্কাউটিং, মেয়েদের পরিচালনকারীদের (girl guides) গ্রামীণ স্তরে স্বেচ্ছামূলক সেবা (village level volunteer service) এবং নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ প্রকল্পগুলিকে জোরদার করতে হবে যাতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা পারস্পরিক চিন্তা ভাবনার আদান প্রদান করতে পারে।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিকতাবাদ ধারণাটি একটি অন্যতম ইতিবাচক ব্যবস্থা। কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদ যখন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে এবং জাতীয়স্বার্থের পরিপন্থী পথ অনুসরণ করে তখন তা প্রতিরোধ করা দরকার।

যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনে কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অটোনমি বা স্বায়ত্তশাসনে মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করা যেতে পারে। অবশ্য রাজ্যের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ও সহায়তার মধ্যে তা বাস্তববায়িত করা উচিত। একটি রাজ্য থেকে ভেঙে নতুন রাজ্য গঠন প্রয়োজনে ভারতে করা হয়েছে, কিন্তু অপ্রয়োজনে এই বিভাজন আর্থিক দিক থেকে অকাম্য রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়গুলিকে সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদের উর্দ্ধে উঠতে হবে। আঞ্চলিক বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির ভাষাগত, শিক্ষাগত এবং অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজন যেমন কর্মে নিযুক্তি, সুস্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে যাতে গণতন্ত্রের মধ্যে সুস্থ আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশ ও সমন্বয় ঘটে।

গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে সকল মানুষের নূন্যতম ভদ্রজীবন যাপন (civic minimum) যথা খাদ্য, বাসস্থান, পরিধান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি প্রদান করার উপর জোর দিতে হবে। অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধির (economic growth) সঙ্গে সঙ্গে সকলের যথার্থ অর্থনৈতিক উন্নয়ন (economic development) ঘটলেই তবে ভারতে যথার্থ উন্নয়ন হবে। একই সঙ্গে সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধ হওয়া দরকার। অনেক সময় দেখা গিয়েছে রাজনৈতিক দল ও সরকার সরকারি অর্থ অবাঞ্ছিতভাবে সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচনে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতে হবে। সরকারি ব্যাংক থেকে যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, তা অবশ্যই জাতীয় স্বার্থে শোধ করা অপরিহার্য। সাম্প্রতিককালে দেখা গিয়েছে কৃষকরা ঋণ করেছে, কিন্তু ক্ষমতাসীন ও রাজনৈতিক দল তা মকুব করে দিয়েছে। এইভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকে লোকসান হয়েছে। প্রসঙ্গত কৃষকরা ব্যক্তিগতভাবে যাতে ঋণ করতে বাধ্য না হয়, সেই ব্যবস্থার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। বস্তুত পক্ষে গরীব কৃষকদের পক্ষে এককভাবে চাষ করা একটি ব্যয় সাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এর জন্য কৃষিজমিতে ব্যক্তিমালিকানাকে বজায় রেখে সমবায় বা যৌথভাবে চাষ ব্যবস্থা (cooperative farming বা collective farming) গ্রহণ করা প্রয়োজন।। যাঁরা প্রান্তিক চাষী ও কৃষি শ্রমিক তারা কাজে নিযুক্ত হয়ে উপকৃত হবেন। এই যৌথ চাষ ব্যবস্থায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কৃষিতে ব্যক্তি মালিকেরা তাদের কৃষিজমির মালিকানার পরিমাণ অনুযায়ী ব্যয় বহন করবে। এই যৌথ চাষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে চাষ করার ঝামেলার অবসান ঘটবে, কৃষি ঋণ করার প্রয়োজনীয়তাও কমবে। উৎপাদিত ফসলও কৃষকদের কাছ থেকে সরকার সরাসরি ন্যায্য দামে কিনে নেবেন এবং বাজারে সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যায্য দামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে।

দল ত্যাগ বিরোধী আইন (Anti-defection Act) কাম্য। কিন্তু বর্তমান আইনে আইনসভায় কোনও রাজনৈতিক দলের মোট সদস্যের ১/৩ অংশ যদি দল থেকে পরিত্যাগ করে তাহলে তা এই আইনে কার্যকরি হবে না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। সংখ্যায় যাই হোক না কেন যে কোনও দলত্যাগ ঘটলেই সেই আসন শূন্য বলে পরিগণিত হবে এবং সেই আসনের পুনর্নির্বাচন আবশ্যিক করা প্রয়োজন। এম. পি., এম, এল. এ-দের সরকারি পেনশন প্রদানের বর্তমান ব্যবস্থা নিয়ে ভিন্নমতের অবকাশ রয়েছে। সাধারণত সরকারি কর্মীরাই সরকারি পেনশন পাওয়ার অধিকার বলেই গণ্য করা হয়। পার্লামেন্টে কোনও আইন পাশ করলেই তা যথার্থ কিনা তা গণতন্ত্রে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে নিরক্ষতা দূর করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার যথার্থ গণতান্ত্রিকরণ প্রয়োজন। এই প্রয়াসে কয়েকটি প্রস্তাব বিবেচ্য—(i) মাতৃভাষা ও ইংরেজিকে একেবারে নার্সারি থেকে শেখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ii) সিলেবাসের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমতা থাকা উচিত। (iii) প্রশ্নপত্র প্রতিটি রাজ্যের আঞ্চলিকভাষা ও ইংরেজিতে হবে এবং মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর স্তরে যেকোনও ছাত্রছাত্রীর নিজের মাতৃভাষা বা ইংরেজিতে উত্তর লেখার সুযোগ থাকবে। কোনও ছাত্রছাত্রীর তার মাতৃভাষায় লেখা উত্তর সেই ভাষায় দক্ষ শিক্ষকের দ্বারা মূল্যায়িত হবে। (iv) শিক্ষকগণ ক্লাসে পড়ানোর সময় রাজ্যের আঞ্চলিকভাষা ও ইংরেজিতে বিষয়টি পড়াবেন যাতে সব ছাত্রছাত্রীর পড়া বুঝতে সুবিধা হয়। এর ফলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলার প্রয়োজন ও চাপ কম হবে। (v) আই. টি. আই. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নূন্যতম দশমশ্রেণী পাশ ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভূতভাবে গুণমান বজায় রেখে

বাস্তবায়িত করতে হবে এবং শিক্ষান্তে তাদের বন্দোবস্ত করে আত্মনির্ভরশীলভাবে গড়ে তোলার সুযোগ থাকবে এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী সরকারি ও বেসরকারি এবং নাগরিক সমাজের সমব্যয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ক্রয় এবং বিক্রয় করার বন্দোবস্ত থাকবে।

১.৭ উপসংহার

পরিশেষে, সকলের ন্যায্য উন্নতিতেই দেশের উন্নতি এই ধারণা বাস্তবায়িত করতে হবে। ভারতে গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে মনীষীদের কিছু সুমহান বক্তব্য আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি—'পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে', 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান', 'হিন্দু না ওরা মুসলিম জিজ্ঞাসে কোন জন বলো সন্তান মোর মার', 'তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া, 'যত মত তত পথ' 'শুধু ভঙ্গি দিয়ে কেন না ভোলার চোখ'। এই মহান আদর্শ ও ধারণাগুলিকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসবে, এই টুকু কাম্য। গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই।

১.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) গণতন্ত্রে সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

খ) গণতন্ত্র সফল করার বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

গ) ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

ঘ) ভারতে গণতন্ত্র রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলি পর্যালোচনা কর এবং তা দূরীকরণের পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর।

১.৯ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Ray, Amal., & Bhattacharya, Mohit. (1962). *Political Theory: Ideas and Institutions.* Eastern Publishers.

ii. Bhattacharya, D. C. (2007). *Indian Government and Politics* (3rd ed.). Kolkata: Vijaya.

iii. Johari, J. C. (1974). *Indian Government and Politics.* Delhi: Vishal Publications.

iv. Mahajan, V. D. (2013). *Political Theory.* S. Chand Publishing.

পাঠক্রম : ১.৫

Unit-2

পুরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজ : পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যান
Civil Society and Political Society with special reference to Partha Chatterjee

গঠন :

২.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ পার্থ চ্যাটার্জীর পুরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজ

২.৪ উপসংহার

২.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

২.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

২.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটিতে প্রাথমিক ভাবে পুরসমাজের ধারনা সম্পর্কে ও পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের ধারনার বিষয়ে শিক্ষার্থী অবগত হতে পারবে। এককটির দ্বিতীয়াংশে পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর মতে নাগরিক/পুর সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজ, এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে শাসিতের রাজনীতি কাকে বলে, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থী একটি বিশ্লেষণাত্মক ধারণা লাভ করতে পারবে।

২.২ ভূমিকা : পুরসমাজ কী?

পুরসমাজ বা (civil society)-র ধারণাটি হল এক কথায় সরকার/রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে এক বৃহত্তর সামাজিক ক্ষমতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং সেই ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্র ও সরকারি ক্ষমতার অবস্থানকে বিরোধিতা করে নিজেকে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা। রোমান চিন্তাবিদ সিসেরো প্রাকৃতিক আইনের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন পুরসমাজ হল এক সভ্য সুশৃঙ্খলিত, সংস্কৃতিবান মনুষ্যগোষ্ঠী যারা রাষ্ট্রীয় আইনকে বাধ্যতা দেখায়। জন লক আবার নিয়ম শৃঙ্খলা অনুশাসন নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বদ্ধ মনুষ্যসমাজকেই পুরসমাজের প্রতিরূপ কল্পনা করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যের নৈরাজ্য থেকে নিয়মানুগ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথেই পুরসমাজের অস্তিত্বের কথা বলেছেন লক। টক ভেলি-র মতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সীমায়িত রাখা এবং রাষ্ট্রকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করার উপায় খুঁজে বের করাই পুরসমাজের দায়। তবে পুরসমাজের ধারণার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বেশি মেলে হেগেল, মার্কস ও গ্রামস্কি-র ব্যাখ্যায়। হেগেলের ব্যাখ্যায় ব্যক্তি পরিবার ও রাষ্ট্রের মাঝে পুরসমাজের অবস্থান এবং সকলের ঐক্যসূত্রে মিলিত। রাষ্ট্র সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারি হলেও

পুরসমাজকে বিলুপ্ত করে দিতে পারে না। পুরসমাজ মানুষকে রাষ্ট্রের উপযোগী করে তোলে। রাষ্ট্রীয় কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ ও অন্যান্য কাজের নানা ক্ষেত্রে পুরসমাজ নেতৃত্ব দেয়। প্রয়োজন হলে পুরসমাজের দায়িত্ব পালন বিষয়ে রাষ্ট্র পরামর্শ দিতে পারে। পুরসমাজ ভুল করলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণও জারি করতে পারে। অর্থাৎ পুরসমাজ স্বাধীন নয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্র কর্তৃক পালন করতে পারে। রাষ্ট্র সামগ্রিক নৈতিকতার প্রতীক। কিন্তু রাষ্ট্রকেও পুরসমাজের ওপর নির্ভর করতে হয়। নাগরিকের মনে যুক্তিসিদ্ধতার ধারণা সৃষ্টি করা পুরসমাজের কাজ! তবে হেগেলের মতে পুরসমাজকে স্বাতন্ত্র দিলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে। মার্কস অন দি জ্যুইস কোয়েশ্চেন (১৮৪৪) এবং ক্রিটিক অফ্ হেগেল্স ফিলসফি অফ্ রাইট (১৮৪৪) ও এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথভাবে দি হোলি ফ্যামিলি রচনাগুলিতে পুরসমাজের ধারণা বিশ্লেষণ করেন। পুরসমাজের সদস্যরূপে ব্যক্তির একটি একান্ত নিজস্ব সত্ত্বা আছে; সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তি এখানে স্বাধীন—অর্থাৎ তার ধর্ম, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে সে স্বাধীন, অনিয়ন্ত্রিত। আবার রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে ব্যক্তি রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সৃষ্টি করে, তার কেন্দ্রবিন্দু যে রাষ্ট্রশক্তি ও তার লৌহদৃঢ় পরিচালন ব্যবস্থা, তাকে উপেক্ষা করে পুরসমাজের সদস্য পুরব্যক্তির স্বাধীনতা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। মার্কস পুরসমাজের মানুষের খন্ডিত সত্তাকে দেখিয়ে বলেছেন, 'আধুনিক (পুঁজিবাদী) রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ভিত্তি পুরসমাজ ও পুরসমাজের মানুষ যে মানুষ স্বাধীন, অপর মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত কেবল ব্যক্তিস্বার্থের বন্ধনে আর অচেতন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে, যে লাভান্বেষী শ্রম এবং নিজের ও অপর মানুষের স্বার্থপর প্রয়োজনের দাস' (আন দি জ্যুইস কোয়েশ্চেন)। কার্ল মার্কস মনে করতেন, পুরসমাজ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ভিত্তি, যা মানুষের স্বাধীনতাকে সীমিত রেখে আসলে রাষ্ট্রের মতোই মিলিয়ে যাবে (witheing away)। কেননা, 'মানুষের তথাকথিত অধিকারের কোনওটিই আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে ছাড়িয়ে যায় না, ছাড়ায় না পুরসমাজের একজন সদস্য, অর্থাৎ নিজের ভিতরে, নিজের ব্যক্তিস্বার্থ ও খেয়ালখুশির ভিতরে রুদ্ধ, মানবসম্প্রদায় থেকে বিযুক্ত এক ব্যক্তি হিসেবে তার অবস্থানকে.....কেবল যখন মানুষ নিজের ক্ষমতাকে চিনতে ও বিন্যস্ত করতে পারবে সামাজিক ক্ষমতা হিসেবে, সামাজিক ক্ষমতাকে আর রাজনৈতিক ক্ষমতার আকারে নিজের থেকে আলাদা করবে না, তখনই সাধিত হবে মানুষের মুক্তি' (অন দি জ্যুইস কোয়েশ্চেন)। আনতিওনি গ্রামস্কি ইতালির মুলোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট শক্তির মোকাবিলায় এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচনে পুরসমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রামস্কি রাষ্ট্রকে পুরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজে ভাগ করে পুরসমাজের কাজটি পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট করেছেন। গ্রামস্কি মতে, ''উপরিকাঠামোর দুটি প্রধান 'স্তর' একটিকে বলা হয় 'পুরসমাজ', এটি হল যে সত্তাগুলিকে ব্যক্তিগত বলা হয় তাদের সমাহার, আর অন্যটি 'রাজনৈতিক সমাজ' বা 'রাষ্ট্র' (প্রিজন্ নোটবুক) এবং এই দুটি স্তরই একে অন্যের পরিপূরক, যদি কোনও পার্থক্য কেউ দেখতে পান, তা অবশ্যই পদ্ধতিগত পার্থক্য। গ্রামস্কি এই দুই স্তরের কাজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আরও বলেছেন যে, একটি স্তরে সমাজ জুড়ে আধিপত্যভোগী গোষ্ঠী যে 'হেজিমনি' বা প্রতিপত্তি বিস্তার করে তাকে নির্দেশ দান করা হয় এবং অন্যস্তরে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আইনগত শাসনের মাধ্যমে 'সরাসরি অবদমন' বা আদেশ বলবৎ করা হয়। গ্রামস্কি প্রতিপত্তি বিস্তারের ব্যাপারে প্রভুত্ব অধীনতা সম্পর্কের সাধারণ চরিত্রটির সন্ধান করেছেন সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রগুলিতে। সংস্কৃতি এবং ভাবাদর্শের ক্ষেত্রগুলির বিস্তার ঘটিয়ে ক্ষমতাভোগী শ্রেণিগুলি তাদের শাসনের বিষয়ে অধস্তন শ্রেণিগুলির এক প্রকার সম্মতি নির্মাণের চেষ্টা করে। এই সম্মতি নির্মাণে প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পড়ে সংবাদ মাধ্যম, শিক্ষা ব্যবস্থা, খেলাধুলা, বিনোদন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম সমূহ, ধর্ম, সংস্কার, জাতপাতের নানা কেন্দ্র, সভাসমিতি, গণসংগঠনসমূহ এবং রাজনৈতিক দলগুলিও! ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি, বহুধাবিভক্ত সামাজিক কাঠামোয় পুরসমাজের মধ্যে সম্মতি নির্মাণ ও অসম্মতি জ্ঞাপনের এক নির্মাণ-বিনির্মাণের খেলা নিয়ত চলতেই থাকে হাররার্ট মার্কিউজ বর্তমান সামাজিক সমস্যাবলির অনুধাবনে পুরসমাজের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে পুরসমাজের তৎপরতা রাষ্ট্রের কাজের দায়িত্ব কমিয়ে দিচ্ছে আর সমাজতান্ত্রিক

সমাজে রাষ্ট্রীয় তৎপরতা পুরসমাজের কাজের গুরুত্বকে মর্যাদা দিচ্ছে না। বাস্তবে, একটা সামাজিক চৌহদ্দির মধ্যে পুরসমাজ এবং রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা নিয়েই থাকার কথা, আর তা না হলেই সমস্যা।

২.৩ পার্থ চ্যাটার্জীর পুরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজ

এই প্রেক্ষিতে পুরসমাজকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জন সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের দুটি ধারণামূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। একটি ধারণা পুরসমাজের সঙ্গে জাতীয় রাষ্ট্রের সম্পর্কযুক্ত, যা দাঁড়িয়ে আছে জনপ্রিয় সার্বভৌমিকতার উপর এবং যা নাগরিকদের সমান অধিকার সুরক্ষার দাবীর স্বীকৃতি দেয়। অন্য ধারণাটি জনগণকে সরকারি কার্যকরি সংস্থা সমূহের সঙ্গে যুক্ত করেই বিভিন্ন জনকল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। প্রথম ধারণাটি রাজনীতির বৃহৎ অঙ্গনে বিগত দুই শতাব্দী ব্যাপী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক তত্ত্বে বিশদে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ধারণাটি কি রাজনীতির অঙ্গনে এত দিন ধরে আলোচিত বিষয়গুলির থেকে একটু আলাদা? পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন হ্যাঁ আলাদা। তাঁর ধারণায় পুরসমাজের ভাবনা থেকে এই ধারণাটি আলাদা এবং একেই তিনি 'রাজনৈতিক সমাজ' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

বুর্জোয়া সমাজে হেগেল ও মার্কস যেমন পুরসমাজের ধারণাটির উপস্থাপন ঘটিয়েছেন, তার সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় একমত; রাষ্ট্রের যে ফর্মাল কাঠামোকে সংবিধান এবং আইন স্বীকৃতি দেয় তাতে সকল সমাজই পুরসমাজ, প্রত্যেকেই একজন নাগরিক, প্রত্যেকেই আইনগতভাবে সমান অধিকারের প্রত্যাশী এবং এই ভাবেই প্রত্যেকেই পুর সমাজের সদস্য। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এখানে রাষ্ট্রীয় অঙ্গ সমূহের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিক্রিয়া পুর সমাজকে বা সংগঠনের তরফে তার কোনও ব্যক্তি সদস্যকে সম্পর্কযুক্ত করে।

কিন্তু এই তাত্ত্বিক ধারণা, ফলিতভাবে সঠিক নয়। ভারতবর্ষের মতো দেশে প্রায় প্রত্যেক বসবাসকারীই সংবিধান অনুযায়ী নাগরিক অধিকার ভোগের অধিকারী। কিন্তু এরা সকলেই পুর সমাজের সদস্য নয়, এবং রাষ্ট্রও এদেরকে পুর সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না কিন্তু এরা রাষ্ট্র কর্তৃক বহিষ্কৃতও নয়, রাজনীতির আঙ্গিনার বাইরেও এদের অবস্থান নয়, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ জনসমষ্টি হিসেবে এরা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ও দেখভালের সুযোগও পায়। এইভাবেই স্বতস্ফূর্তভাবে এই জনগণ নির্দিষ্ট কোনও কোনও রাজনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কখনই সংবিধান অনুযায়ী পুর সমাজ যেভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত থাকে, তেমনটি নয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক শর্তাবস্থায় এই জনসমাজ রাষ্ট্রীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, এবং নৈতিকতার ভিত্তিতে একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থায় পরিণত হয়; অবশ্যই প্রতিযোগিতার নিরিখে এই শর্ত, অবস্থার তারতম্য ঘটে। প্রশ্ন কিভাবে আমরা এই প্রক্রিয়াকে বুঝব?

এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্র পরিধির বাইরে সকল প্রতিষ্ঠানকেই পুর সমাজের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। নয়া উদারবাদীরা আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা, বেসরকারি সংগঠনগুলি, বিশেষ করে এন.জি.ও. এবং আর্থিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুর সমাজের মুক্ত সদস্যরূপে চিহ্নিত করেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায় নীতিগতভাবে এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন না। কারণ তাঁর মতে ভারতের মতো অনেক দেশেই সনাতনী সামাজিক কর্তৃত্ব ও অভ্যাসগুলি পরিবর্তিত হয়ে বুর্জোয়া পুর সমাজে মিশে গেছে। এসব দেশে আদর্শ হিসেবে পুর সমাজ শুধু যে অংশ গ্রহণে উৎসাহ দেয় তা নায়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে, কিন্তু এদের কার্যকরি ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আটকে থাকে। ভারতের মতো দেশে আধুনিকতা ও গণতন্ত্রের সম্পর্কের বিচারে এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিৎ।

সাব অল্টার্ন স্টাডিজে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গীরা আগেই রাজনীতির ক্ষেত্রটিকে (ক) এলিটদের ক্ষেত্রে এবং

(খ) অসংগঠিত সাব অল্টার্নদের রূপে ভাগ করে নিয়েছেন। এই বিভাজনের মূলে ছিল ভারতীয় কৃষকদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন দশক পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপক হারে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে অংশ নেওয়া এবং সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া, কিন্তু বিবর্তিত উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। উদারবাদী এবং মার্কসবাদী ইতিহাসকাররা মনে করতেন যে ভারতীয় কৃষকেরা ''প্রাক রাজনৈতিক'' পর্বের যৌথ আন্দোলনে বদ্ধ আছে। কৃষকেরা যৌথ রাজনৈতিক আন্দোলন করলেও, নিজেদেরকে সব সময় এলিটদের থেকে ভিন্ন রেখেছেন। এই এলিট এবং সাব অল্টার্ন রাজনীতির প্রেক্ষিতে, উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভারতে ক্রমেই সাব অল্টার্ন শ্রেণিকে নিজের প্রভাবে এনে ফেলে। এই যে নতুন সংযুক্তিকরণ এলিট এবং সাব অল্টার্নদের মধ্যে ঘটে এর মধ্যেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক ভাবনাকে খুঁজে পেয়েছেন।

এই বিষয়টির প্রমাণ পার্থ চট্টোপাধ্যায় কতকগুলি কেস স্টাডির মধ্য দিয়ে দিয়েছেন, যেখানে আমরা দেখতে পাব, একদল মানুষকে লক্ষ্য করে সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দিয়ে কিভাবে রাজনীতি উঠে আসছে এই গোষ্ঠীর লোকেরা অনেক ক্ষেত্রেই সংগঠন করে নিবিড় বৈধতা ভিত্তিক সংগ্রাম করেছে জীবন ও জীবিকার জন্য এরা কখনও বেআইনি বসতকারী, কখনও বা অবৈধভাবে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী, আবার কখনও বা বিনা টিকিটে যাত্রী। তবে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি এবং (এন.জি.ও.)-গুলি এদের উপেক্ষাও করতে পারে না, যেহেতু এদের মতো সহস্র সংঘ এবং প্রতিনিধিত্ব মূলক গোষ্ঠী জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে এই আইনি অবৈধতার মাধ্যমে। ফলে রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও এন. জি. ও.-গুলি এই সব সংঘকে নাগরিক সভা হিসেবে মর্যাদা দেয় না, প্রশাসনিক কল্যাণের জন্য এই প্রান্তিক ও সুবিধাভুক্ত নয় এমন জনগোষ্ঠী হিসেবেই এদের সঙ্গে ব্যবহার করে।

এই গোষ্ঠীগুলির মানুষেরা জানে যে তাদের এই আচরণগুলি ভালো/পুর আচরণ নয়, কিন্তু জীবন ও জীবিকার জন্য তাদের এমন আচরণ করতেই হয়। ফলে, তারা ভালো বাসস্থান পেলে অবৈধ দখলিবাস্তু ত্যাগ করতে ইচ্ছুক থাকে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা জনকল্যাণের তাগিদে এদের সহায়তা করতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠে, কিন্তু এদের দাবিগুলিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে গেলে পুর আইনের বৈধতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেওয়া হয়। এই ধরনের বিশেষ রাজনৈতিক অঞ্চলের দাবি দাওয়াগুলির আলোচনা ভিত্তিক সমাধানের দুটি দিক থাকে; (ক) সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির একটা রাজনৈতিক দায় থাকে এই সব দীন-দরিদ্র, সুযোগ সুবিধাহীন জনগণের দেখাশুনা করার; (খ) এই সব জন গোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক বিবেচনা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এর সাহায্যে সরকারের কাছ থেকে তাদের দাবি পুরণের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত এই গোষ্ঠীগুলিও নিজেদের দাবিগুলো পরপর সাজিয়ে নিয়ে অনেক গোষ্ঠীর সঙ্গে যাদের কাছ থেকে এই ধরনের পরিস্থিতিতে সহায়তা পেতে পারে তাদের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখে, বিশেষ করে যারা সুবিধাপ্রাপ্ত প্রভাবশালী গোষ্ঠী। সরকারি কর্মকর্তা এবং সম্ভব হলে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নির্বাচনে ভোটদানের অঙ্গীকারকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে, যাতে তারা সত্যিই নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে যা নিছক প্রশাসনিকতা এখানে প্রশাসনিকতার একটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন,—প্রশাসনিকতার মূল কথা হল, ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য, কোনও সাধারণ অর্থে কল্যাণ নয়, বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ কল্যাণের জন্য। ক্ষমতা প্রয়োগ মানে এখানে সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ নয়, বরং জনগোষ্ঠীর এক এক অংশের ব্যবহার, প্রবণতা, চাহিদা স্বার্থ ইত্যাদি যাচাই করে তার মাধ্যমে জনকল্যাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। থেকে পৃথক রূপ ধারণ করে।

পুর সমাজের সদস্য ভুক্তি হয় সংস্কৃতিবান এক ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে ভারতের মতো দেশে তাঁরাই আধুনিকতার চরম নির্ণায়ক, সাংবিধানিক মডেলটিও এইভাবে তৈরি। কিন্তু ফলিত ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলিকে তাদের উচ্চ অবস্থান থেকে

নেমে এসে রাজনৈতিক সমাজের প্রাঙ্গণে তাদের আপন বৈধতা নির্মাণ করতে হয়, এবং এ বিষয়ে সম্যক ধারণা তৈরি করতে হয় কার্যকরি রাজনৈতিক সচল দাবিগুলোর প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকেরা যেভাবে ''রাজনৈতিক সমাজ'' বলতে রাষ্ট্র'কে বুঝিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে তার থেকে ভিন্ন এক ব্যাখ্যা তৈরি করেছেন। এই ব্যাখ্যাকে উপযুক্ত করে তোলার জন্য তিনি আমাদের সামনে রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে থেকে ঘুরে আসার কয়েকটি যাত্রা পথ নির্মাণ করেছেন, এবং বিষয়টিকে ''শাসিতের রাজনীতি'' (The Politics of the Governed) বলে আখ্যা দিয়েছেন।

১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের হেতু দক্ষিণ বঙ্গের কৃষক, ক্ষেত মজুর এর দল কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হয় জীবন ও জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে। এর কিছু দিনের মধ্যেই কলকাতার রাস্তায় রোজই জন স্রোতের জোয়ার বইতে থাকে। তার মূল কারণ দেশভাগ ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ। এই সময় থেকে এক দশক অবধি এই উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশের কারণে শহর কলকাতার লোকসংখ্যা প্রায় তিন গুণ বেড়ে যায়। এদের অধিকাংশই সরকারি জমি, বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে অবৈধভাবে বসবাস করতে শুরু করে এর পেছনে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মৃদু প্রশয় ছিল। কারণ তা না হলে এরা যাবে কোথায়? এবং উদ্বাস্তু অধিগৃহীত এই অঞ্চলগুলো পরিচিত হয়ে উঠে কলোনী রূপে ঢাকুরিয়া অঞ্চলে রেলওয়ে ট্র্যাক এর কাছাকাছি অঞ্চলে এমন একটি কলোনী গড়ে উঠে, যেখানে প্রাথমিক স্তরে দু-পাঁচজন ব্যক্তির নেতৃত্বে বেশ কিছু মানুষ আহূত হয়ে বসবাস করতে শুরু করে। এই নেতৃত্বে থাকা মানুষেরাই জমিকে প্লটে ভাগ করে উদ্বাস্তু শরণার্থীদের কুটির ঘর তৈরি করতে সাহায্য করে এবং নতুন বাসিন্দাদের কাছ থেকে ভাড়া নিতেও শুরু করে, ১৯৭০-র মধ্যভাগ অবধি এই অঞ্চলে অধীর মন্ডল, হরেন মান্না এই কলোনীর মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেন। এরা দুজনেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির তখন অবধি যা ক্রমশ শক্তিশালী রাজনৈতিক বিরোধী দল হিসেবে গড়ে উঠছে, তার সঙ্গে সম্পর্কিত অধীর মন্ডল এবং হরেন মান্না কলোনীর মানুষের তরফে রেলের কর্তৃপক্ষ, পুলিশ এবং সরকারি সংগঠনের সঙ্গে কথাবার্তা জারি রাখেন। অধীর মন্ডলের মালিকানায় ছিল ২০০টি কুটির এবং তিনি অঞ্চলের জমিদার বলে পরিচিতি পান। পার্টির নেতারা অধীর এবং হরেনের কাজকর্মে এক ধরনের চাতুরতা এবং অপকর্মের ছোঁয়া দেখলেও রাজনৈতিক সুবিধার জন্য তাদের প্রশ্রয় দেন। বিভিন্ন সময়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এই কলোনির উচ্ছেদ চেয়ে অসফল হয়েছে। ১৯৬৫ সালে একজন রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ট্রেন লাইন ও কলোনির মাঝে দেওয়াল তোলার চেষ্টা করেও বিফল হন। ১৯৭৫-র জরুরি অবস্থার সময়ে উচ্ছেদের আশংকা চরমে উঠলে, রেল কলোনির বাসিন্দারা তখনকার সোভিয়েত পন্থী কমিউনিস্ট পার্টির এক নেতাকে ধরে (যেহেতু তখন শাসক দলের সঙ্গে এদের সম্পর্ক গাঢ় ছিল) মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে উচ্ছেদ আটকায় ছিল। এক ধরনের প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক, ভোট ব্যাংকের আশ্বাস, দলতাগ্যী নেতৃত্বের মাধ্যমে সুবিধা প্রাপ্তি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিকভাবে জন গোষ্ঠীকে একত্রিত করার এই রকম উদাহরণ সেই সময় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮০ সালে অধীর মন্ডলের মৃত্যুর পর অবস্থার অন্য এক ধরন দেখা দেয়। ১৯৮৩ সালে রেলওয়ের থেকে জবরদখল ভাবে এই কলোনির উচ্ছেদের চেষ্টা করা হয় এবং রেল লাইন বরাবর একটি কাঁটা তারের বেড়া তৈরি করা হয়। কলোনিতে ইতিমধ্যে অনাদি বেরা নামে এক নতুন নেতার আবির্ভাব হয়। তিনি ওই কলোনির একটি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। উচ্চশিক্ষা না থাকলেও, কলোনির শিশুদের অক্ষর জ্ঞানের কাজটি তিনি ভালোই সম্পন্ন করেন।

তারই নেতৃত্বে কলোনির মানুষ রেলওয়েজের এই প্রচেষ্টাও রুখে দেয়। শিক্ষকতার বাইরে অনাদি বেরা ছিলেন একজন ভালো যাত্রা অভিনেতা। কলোনিতে যাত্রা পালাগানের অনুষ্ঠান করে তিনি মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৮৩-র প্রতিরোধ আন্দোলনের তিনিই মুখ্য কারিগর। তিনি কলোনিতে 'জনকল্যাণ সমিতি' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে, সেখানে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় পৌর আধিকারিক, রাজনৈতিক নেতা, স্থানীয় পুলিশ স্টেশন এবং

কলোনির নিকটবর্তী নাগরিক বসতির থেকে প্রয়োজন ভিত্তিক আর্থিক অনুদান নিয়ে এই কর্মকান্ড সমাধা হয়। এই সময় থেকেই সরকার ICDS সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের কাজ শুরু করায় অনাদি বেরার উদ্যোগে কলোনিতে একটি চাইল্ড কেয়ার, শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রও তৈরি হয়। যেখানে শিশুদের পোলিও, টিবি প্রভৃতির প্রতিরোধে টীকাকরণ শুরু হয়। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের সরকারি কর্মচারিরা কলোনির মানুষ জনের জীবনযাত্রা, আয়-ব্যয়, স্বাস্থ সবকিছুরই রেকর্ড বা নথি সংরক্ষণ করতে শুরু করে। এইভাবে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে আপাত আন্দোলনকারী একটি জনগোষ্ঠী সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকে। ক্রমে ক্রমে এই কলোনির জনগোষ্ঠী রেলওয়ে, পুলিশ, পৌর আধিকারিক ও বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান (এন.জি.ও.) প্রভৃতির কাছ থেকেও জীবন ও বসতি পেতে থাকে; এমনকি অবৈধ ভাবে বিদ্যুত ব্যবহার করতে থাকে ও পরবর্তী সময়ে (১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে) সম্মিলিতভাবে বিদ্যুতের মাশুল দেওয়া শুরু করে। এইভাবে একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যেখানে সুযোগ সুবিধা ও কল্যাণ ক্রমশই বাসিন্দাদের জীবন ধারণে সহায়ক হয়ে ওঠে। যদিও তাদের অবস্থান ছিল আইনগতভাবে বিপরীত মেরুতে। সরকারি তরফে এই কাজগুলিকে প্রশাসনিকতার ধারায় ফেলা গেলেও, এই জনগোষ্ঠীও নৈতিকভাবে তাদের সম্মেলক একটি পরিচিতিও আদায় করে নেয়। 'শাসিতের রাজনীতি'র এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, ''to give the empirical form of a population group the moral attributes of a community" এই কলোনির চরিত্র সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক। কারণ এদের কেউ এসেছেন দক্ষিণ বঙ্গ থেকে, কেউ বা এসেছেন পূর্ব পাকিস্তান (আধুনিক বাংলাদেশ) থেকে। বেশির ভাগ মানুষই মধ্যবিত্ত ও নিচু জাতের। ১৯৯০ মধ্যবর্তী সময়ে একটি নমুনা সমীক্ষায় জানা যায় যে বসতির ৫৬ শতাংশ মানুষ তপশিলি জাতি (যারা সরকারি স্বীকৃতিতে অস্পৃশ্য জাতি থেকে উত্তরিত হয়েছে) ৪ শতাংশ তপশিলভুক্ত উপজাতি, বাদবাকি সব হিন্দু জাত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের সকলেই মনে করত তারা সবাই মিলে একটা পরিবার, এবং দীর্ঘদিন এখানে বাস করার ফলে এই বসতিই তাদের নিজস্ব বসতি। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, (ক) একই পরিবারভূক্তি, (খ) একই ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থান, (গ) আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য, (ঘ) সর্বজনীন বিনোদন, (ঙ) ধর্ম (শীতলা পূজা, কালি পূজা), (চ) জনকল্যাণ সমিতি, (ছ) জন বসতি ও জন ঘনত্ব এর কারণে এরা ক্রমেই নিজেদেরকে একটা অনন্য সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক সমাজ বলে ভাবতে শুরু করে।

এই ভাবনার সার্থকতা অবশ্যই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, ''The success of the these claims depend entirely on the ability of particular population groups to mobilize support to influence the implementation of government policy in their favour". ২০০২ সালে হাইকোর্ট স্থানীয় মানুষের আপত্তির ভিত্তিতে (রবীন্দ্র সরোবরের জল দূষণ) এই বসতি উচ্ছেদের রায় দিলে এবং তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার পুলিশি অ্যাকশন নিতে চাইলে এই জনগোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বদল করে তৃণমূল কংগ্রেসের সহায়তায় (যেহেতু তখনকার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছিলেন তৃণমূল দলের) নিজেদের বসতি টিকিয়ে রাখে। রাজনৈতিক সমাজ এইভাবে তাদের রাজনীতির কৌশল স্থির করে।

রাজনৈতিক আনুগত্য বদলের আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় পূর্ব উল্লিখিত রেলওয়ে কলোনির খুব কাছেই গড়িয়াহাটে ফুটপাথ দখলকারি ব্যবসায়ীদের আচরণে। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এখনও অবধি মানুষের অবাধ বিচরণক্ষেত্র ফুটপাথগুলি ক্রমশই নিচুতলার মানুষের ব্যবসায়িক কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে সহস্রাধিক মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করা শুরু করে। এরা সবাই রাজনৈতিক সমাজের মতো কৌশল অবলম্বন করে রাজনৈতিক দল, নাগরিকদের সমর্থন আদায় করে অবৈধভাবে দখলিকৃত এই অঞ্চলে নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা চালু রাখে। কিন্তু ১৯৯০-র দশকের মধ্যভাগে হাওয়া একটু উলটো দিকে বইতে শুরু করে। কলকাতার ফুটপাথ পরিস্কার করার সরকারি নির্দেশে তদানীন্তন বামফ্রন্ট মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশ ও পুরসভার লোকেদের সম্মিলিত প্রয়াসে ''অপারেশন সানশাইন" নামে দু সপ্তাহ ব্যাপী এই উচ্ছেদ কর্মসূচি বহাল থাকে। ফুটপাথবাসী হকাররা বোঝে তারা আর বামেদের কাছে শ্রেয় নয়, ফলে তাদের রাজনৈতিক

আনুগত্য বদলে যায়। সরাসরি শারীরীকভাবে তারা কোনও প্রতিরোধ করে না, বরং তাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থায় স্বীকৃতি দিয়ে, অবৈধ দখলদারী ত্যাগ করে। পরবর্তীকালে নতুন রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্রয়ে তাদের পুরোনো অবস্থানে তারা আবার ফিরে আসে।

এখানে খেয়াল রাখা দরকার যে, সকল জনগোষ্ঠীই রাজনৈতিক সমাজে পরিণত হবার প্রক্রিয়ায় সফল হয় না। কলেজ স্ট্রিটে ভারতের প্রকাশনা জগতের পীঠস্থানে, দফতরী পাড়ায় যেখানে বই বাঁধানো হয়, সেখানে প্রায় চার হাজারের উপর শ্রমিক পাঁচশো মালিকের নেতৃত্বে বই বাঁধানোর কাজে লিপ্ত থাকত। ২০ বা তার অধিক শ্রমিক খুব বেশি হলে তিন হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গায় একসঙ্গে থাকত। ১৯৯০ সালে স্থায়ী কর্মীদের বেতন ছিল সর্বাধিক ৬০০ টাকা (বিশ্বমানে ১৮ ডলার)। প্রত্যেক ইউনিটে এক মালিক দু'জন শ্রমিক, কাজের চাপ বাড়লে তৃতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হত। এদের মধ্যে দক্ষ অস্থায়ী কর্মীরা ৫০০ টাকা প্রতিমাসে বেতন পেত, আর অদক্ষ মহিলা কর্মীরা ৪০০ টাকা বেতন পেত। শিশু শ্রমিকরা ১৫০ টাকা বেতন হিসেবে পেত। ভারতবর্ষের শিল্প ক্ষেত্রে কর্মচারীদের তুলনায় এই বেতন ছিল অত্যন্ত কম, কিন্তু এই অসংগঠিত শ্রমিকরা কেতাবি ভাষায় ইনফরমাল সেক্টর বলে বিবেচিত হত।

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পরে বামফ্রন্টের বৃহৎ শরিক দল সি.পি.আই(এম) এই দফতরী পাড়ার শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ন তৈরির চেষ্টা করে। ফলস্বরূপ ১৯৯০ সালে মাত্র ১০০ টাকা মাসিক বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দফতরী পাড়ার বই বাঁধাই শ্রমিকেরা তিন দিনের ধর্মঘট শুরু করে, বই বাঁধাই এর মালিক ও শ্রমিকরা প্রকাশকদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থা জানায় তারা অন্য জায়গা বা রাজ্যের বাইরে থেকে বই ছাপানোর কাজ শুরু করবে। শেষ অবধি মাসিক বেতন ৭৫ টাকা বৃদ্ধি হওয়ায় দফতরী পাড়ার বই ছাপানো শ্রমিকেরা আপোষের পথে হাঁটে। দফতরী পাড়ার শ্রমিকেরা নির্বাচনে বামেদের ভোট দিত। এই রাজনৈতিক চেতনা তারা লাভ করে তাদের গ্রামীণ সম্পর্কের জন্য, তাদের শ্রমিক সত্ত্বার জন্য নয়, বরং তাদের আচরণে মালিকদের প্রতি আনুগত্য ও এক ধরনের পেরেন্টাল কেয়ার পাবার আশ্বাস ছিল। দফতরী পাড়ার শ্রমিকেরাও শেষ অবধি রাজনৈতিক সমাজে পরিণত হতে পারেনি।

রাজনৈতিক সমাজের সঠিক ছবি দেখতে পাওয়া যায় গ্রাম বাংলায়। ৭০-র দশকের শেষ দিক থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসার পর, বামেরা প্রশাসনিকতাকে সরকারের মুখ্য কাজ হিসেবে ধরে নিয়ে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানীয় জনগণের সমর্থন পেয়ে কাজ শুরু করে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, কিভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের, যাদের উদ্ভব ও আবাস অবৈধতার গন্ডিতে বাধা, তাদের দাবিকে সমভাবে বৈধ নাগরিকদের দাবির সঙ্গে একসূত্রে বিবেচনা করা হবে? পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে, রেলওয়ে কলোনির অনাদি বেরার কথা, যিনি একজন ভালো অভিনেতা ও শিক্ষক। আসলে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সমাজের বিস্তার লাভের জন্য স্কুলের শিক্ষকদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ১৯৯৭ সালে দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলার স্কুল শিক্ষকদের উপর একটি সন্দর্ভ তৈরি করেন। পুরুলিয়া জেলায় তিনি লক্ষ্য করেন যে প্রাইমারি স্কুলগুলির শিক্ষকেরা প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট শিক্ষক সমিতির সদস্য এবং এরা অনেকেই স্থানীয় প্রশাসনের নির্বাচিত প্রতিনিধি। অনেকেই পার্টির উঁচু দায়িত্বে আছেন এবং কৃষক সংগঠনের নেতা, ততোধিক রাজ্য বিধানসভায় ও সংসদে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিতও হন। এদের মধ্যে অনেকেই গান্ধীপন্থী সামাজিক উদ্যোগের সাথে আগে জড়িত ছিলেন; ১৯৮০-র সময় কাল থেকে কমিউনিস্টরা যখন থেকে 'ভূমিসংস্কার' ও 'কৃষি উন্নয়ন' কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে এক প্রণয়মূলক সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন থেকেই স্কুল শিক্ষকেরা জেলার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সনাতন ভূস্বামীদের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে শিক্ষকেরাই হয়ে ওঠেন সহমতের রাজনীতির পরোধ্যা ব্যক্তিত্ব।

২.৪ উপসংহার

উদারবাদী পুর সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের পার্থক্য করতে গিয়ে মাথায় রাখতে হবে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষেরা যেভাবে সচল ও সংগঠিত হয়ে সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হয় তা কিন্তু কখনই পুর সমাজের সদস্য হিসেবে করে না। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য তারা যখন ও যেখানে যেমনতর চাপ সৃষ্টি করা দরকার সেইভাবেই সরকারি কৃত্যকের ভিন্ন ভিন্ন অংশে চাপ দেয়। পুর্বেকার প্রান্তিক অবস্থান থেকে সরে এসে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী প্রয়োজনমতো একধরনের ঘুরিয়ে-বাঁকিয়ে নিজেদের অনুকূলে সরকারি সিদ্ধান্তকে কার্যকরি করে তোলা। এইভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এক ধরনের স্থানীয় গণ সমর্থনের ভিতর দিয়ে সমাজে ক্ষমতার বণ্টনকে সামগ্রিকভাবে কার্যকরি করে তোলা। স্কুল শিক্ষকেরা যখন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন এবং প্রশাসনের কাছে দরিদ্র গ্রামবাসীদের দাবি আদায় করতে সমর্থ হন, তখন কিন্তু তারা স্থানীয় স্তরে সমর্থন পেলেও সার্বিক স্তরে পুর সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন হতে পারেননি। বরং তারা চেষ্টা করেছেন ঐতিহাসিকভাবে বণ্টিত ক্ষমতার অসম বিভাজনের ভিত্তি সত্ত্বেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিভাবে মধ্যস্থতা গড়ে তোলা যায়। তারা যারা শাসক আর যারা শাসিত তাদের মধ্যে মধ্যস্ততা করার কাজেই নিয়োজিত থেকেছেন। এটাও স্মরণে রাখার দরকার, যেখানেই রাজনৈতিক সমাজ সার্থকভাবে দরিদ্র জনগণের মধ্যে সরকারি কর্মসূচিগুলিকে সচল রাখতে পেরেছে সেখানেই জনগণের স্বাধীনতার বিকাশ ঘটেছে। যা কখনই পুর সমাজে সম্ভব নয়। সাধারণভাবে সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলি সামাজিক কাঠামোর অসমতাকে ভিত্তি করে শ্রেণি, মর্যাদা বা সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির মধ্যে, যেভাবে ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে, সেভাবে বণ্টিত হয়। এইভাবে জন্ম নেয় দুর্নীতি, প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রবল অপব্যবহার। এটা খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটে, যেহেতু অনেকেই জানে না তাদের প্রকৃত দাবিগুলি কি বা কি তাদের প্রাপ্য ছিল, যা থেকে তারা বঞ্চিত। ভারতবর্ষের মতো দেশে, এই বিষয়টি একটি অতি পরিচিত সাধারণ বিষয়। উন্নত দেশে যেখানে একটি সংস্কৃতিবান মধ্যবিত্ত সমাজ রয়েছে সেখানে তারা শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক সুযোগ সুবিধা পায়। কিন্তু ভারতের মতো দরিদ্র দেশে রাজনৈতিক সমাজ তার সচলতার মধ্যে দিয়েই সরকারি কর্মসূচিগুলিকে দীন ও দুস্থ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে পারে। কেননা এসব ক্ষেত্রে পুর সমাজকে কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না।

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি, পাশ্চাত্য মতে, উদারবাদী ধারণায় রাজনৈতিক সমাজের যে ধারণা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ভারতের মতো দেশে রাজনৈতিক সমাজর ধারনা (পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যান) সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতের মতো উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পুর সমাজের মতো প্রতিষ্ঠান কার্যত খুবই অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং বৃহৎ সংখ্যক প্রশাসনিক কার্যাবলী, প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠী পুর সমাজের আওতার বাইরেই অবস্থান করে। ফলে পুর সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানই এখানে রাজনৈতিক সমাজ নামে পরিচিত। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এমন ভাবনার পেছনে দুটি কারণ বিদ্যমান বলে আমাদের মনে হয়। প্রথমত: পুরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং দ্বিতীয়ত: প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনৈতিক সমাজের বিশেষ কার্যাবলী ও গুরুত্ব অনুধাবন।

২.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) পুরসমাজ বলতে কী বোঝায়?

খ) পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকগণের মতানুসারে পুরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজ নিয়ে বিশদে আলোচনা কর।

গ) শাসিতের রাজনীতি বলতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় কী বোঝাতে চেয়েছেন?

ঘ) পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে পুরসমাজ থেকে রাজনৈতিক সমাজের যাত্রাটির একটি বিশ্লেষণাত্মক রচনা লেখ।

২.৫ সহায়ক পাঠ্যগ্রন্থ

i. Chatterjee, Partha. (2001). On Civil and Political Society in Postcolonial Democracies. In S. K. Sudipta Kaviraj (Ed.), *Civil Society: History and Possibilities.* Cambridge University Press.

ii. Chatterjee, Partha. (2004). *The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World.* Columbia University Press .

iii. Damle, Madhura. (2015). *Civil Society in Political Society.* (P. Basu, Ed.) Kolkata: Setu Prakashani.

পাঠক্রম : ১.৫

Unit-3

ভারতের রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আশিস নন্দী এবং সুদীপ্ত কবিরাজের ভাবনা

State and Political Culture in India with special reference to Ashis Nandy and Sudipta Kaviraj

বিষয়সূচি :

৩.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে আশিস নন্দীর বিশ্লেষণ

৩.৪ ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে সুদীপ্ত কবিরাজের বিশ্লেষণ

৩.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৩.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটির প্রথমাংশে ভারতে রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে আশিস নন্দীর ধারনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককের দ্বিতীয়াংশে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে সুদীপ্ত কবিরাজের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

৩.২ ভূমিকা

স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়ে বৌদ্ধীক ভারতে চর্চা বহুদিনের। ১৯৫০-এর দশকের পশ্চিমে নির্মিত আধুনিকীকরণ এবং কাঠামো কার্যবাদী তত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য ছিল তথ্য ব্যথিত 'তৃতীয় বিশ্বের' সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করে কীভাবে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে পথ প্রদর্শন করা। ভারতের রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের তত্ত্বের বিভিন্ন সমর্থক এবং গবেষক জাতি-রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ সম্পর্কিত পশ্চিমী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাষ্ট্রের নিরিখে ভারতের সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন করেছেন। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ঘটেছে ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই। পরবর্তীকালে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা আমদানী হলে সমাজ এবং সংস্কৃতির জাতি-রাষ্ট্রের অনুকূলে সংস্কার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে ভারতের আধুনিকতাবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে। ভারতের সংস্কৃতি তথা রাজনৈতিক সংস্কৃতি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না, এই বিতর্ককে দূরে সরিে. রেখে আশিস নন্দী সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে পশ্চিমী জাতি রাষ্ট্রের এবং পশ্চিমী আধুনিকতাবাদগী দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করার

বিরুদ্ধে। তিনি রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছেন। এই অংশে আমরা রাষ্ট্র সম্পর্কে আশিস নন্দীর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রথমে আলোচনা করবো।

একথা অনস্বীকার্য্য যে ভারতের গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল উপনিবেশীক শাসনকালে। ভারতীয়দের বিশেষ করে ভারতের পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ও এলিট শ্রেণীকে শাসনকার্য পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করে তাঁদেরকে ঔপনিবেশিক শাসনের হাতিয়ারে পরিণত করার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে ভারতে সীমাবদ্ধভাবে গণতন্ত্রের সূচনা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মন থেকে ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা দূর করে ঔপনিবেশীক শাসনকে জনগণের নিকট বৈধ করে তোলা। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ এবং ১৯৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল তাকে দূর্বল করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার ভারতে সীমাবদ্ধভাবে গণতন্ত্রের সূত্রপাত করে। ১৮৬১ সালের Indian Council Act, ১৯০৯ সালের Morley Minto Reforms Act, ১৯১৯ সালের The Government of India Act এবং ১৯৩৫ সালের The Government of India Act-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতে সংসদী গণতন্ত্রের ধাঁচ তৈরী করে। তবে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কর ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃত হয় নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্রে ভোটাধীকারের নীতি গৃহীত হয়। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে পশ্চিমী উদারগণতন্ত্রের ঢেউ লাগলেও, প্রথম থেকেই ভারতে উদার গণতন্ত্র বিরোধী জাত-পাত এবং সাম্প্রদায়ীক রাজনীতি সক্রিয় ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রধান উপাদানগুলি হল : জাত-পাত, ধর্ম, প্রাদেশীকতা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক হিংসা। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ভাবনার উদ্ভব ঘটেছে পশ্চিম ইওরোপের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। গণতন্ত্রের জন্য ..... ঔপনিবেশিক কথা বলেন তার অধিকাংশগুলি ভারতের সমাজ এবং সংস্কৃতির মধ্যে অনুপস্থিত থাকলেও স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের গণতন্ত্র কেবল টিকে রয়েছে তা নয়, সমগ্র বিশ্বের নিকট ভারতের গণতান্ত্রীক ব্যবস্থা নিজেকে মডেল হিসাবে তুলে ধরেছে। একটি বহু সংস্কৃতির দেশে কীভাবে গণতান্ত্রীক রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণ করা যায় তার উদাহরণ ভারত। কিন্তু মার্কসবাদীরা বলেন এটা বুর্জোয়া গণতন্ত্র। তবে ভারতের মূল স্রোতের মার্কসবাদীরাও তথাকথিত 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রে' অবগহন করেছেন। উদারনীতিবাদীরা বলেন ভারতের গণতন্ত্র যথার্থ গণতন্ত্র। আবার অনেক পণ্ডিত রয়েছেন যাঁরা অগণতান্ত্রিক উপাদানগুলির রাজনীতিকরণ ঘটেছে বলে ভারতের গণতান্ত্রীক ব্যবস্থা টিকে আছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সাম্প্রতিককালে ভারতের গণতন্ত্র টিকে থাকবে কারণ অনুসন্ধানের রত হয়েছেন বিভিন্ন পণ্ডিত এবং গবেষক রজনী কোঠারী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ভারতের গণতন্ত্র টিকে আছে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে। তিনি ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির দীর্ঘ ঐতিহ্যকে গণতান্ত্রীক বলে মনে করেছেন। এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন সুদীপ্ত কবিরাজ। তাঁর মতে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্র বিরোধী ভারতের রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে সুদীপ্ত কবিরাজের ভাবনার সুস্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর রজনী কোঠারীর ভাবনা খণ্ডন করার মধ্যে দিয়ে। এ বিষয়ে আমরা আলোচ্য অধ্যায়ের শেষাংশে আলোচনা করবো।

৩.৩ রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে আশিস নন্দীর বিশ্লেষণ

আশিস নন্দী রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে যে তাত্ত্বিক বিতর্কের অবতারণা করেছেন সেখানে তিনি রাষ্ট্রকে সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির সম্পর্ককে দু'টি দিক থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, সংস্কৃতির দেখা যেতে পারে আধুনিক রাষ্ট্রের বিকাশ এবং বক্তার মাধ্যম হিসাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রকে দেখা হয় ব্যতিক্রমগুলি সর্বজনীননীতির আধার হিসাবে। অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্রের কতকগুলি নীতি রয়েছে যা অলঙ্ঘনীয়। সংস্কৃতির যে সকল উপাদানগুলি আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে সহায়ক সেগুলিকে ভলো বলা হবে। অন্যদিকে সংস্কৃতির যে সকল উপাদান আধুনিক রাষ্ট্রের বিকাশের অন্তরায় সেগুলিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক সমাজ নির্মাণ এবং রাষ্ট্র

পরিচালনার জন্য ত্রুটিপূর্ণ সংস্কৃতির উপাদানগুলি ধ্বংস করার কথা বলা হয়। এখানে রাষ্ট্র পরিচালকদের কর্তব্য হল সংস্কৃতির আধুনিকতা বিরোধী উপাদানগুলি দূর করা।

আশিস নন্দীর উল্লেখিত দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির সম্পর্ককে সংস্কৃতির নিরিখে বিবেচনা করা। এই দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রকে দেখে সংস্কৃতির রঞ্জক এবং অভ্যন্তরীণ সমালোচক হিসাবে। এর সমর্থকরা মনে করেন রাষ্ট্রের কাজ হল সংস্কৃতিকে রক্ষা করা। সংস্কৃতিকে সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, সেই উদ্যোগ আসবে সমাজের মধ্যে থেকে। আধুনিকতার নামে রাষ্ট্র শক্তি সমাজের উপর কোনো বিশেষ সংস্কৃতিক চাপিয়ে দেবে না। নন্দীর মতে অ-আধুনিক সমাজে যাঁরা পুরাতন ভাবনা এবং রীতি-নীতি নিয়ে চলতে চান তাঁদের নিকট 'Culture oriented approach to the state' হল স্বাভাবিক। অন্যদিকে 'State oriented approach to culture' হল চাপিয়ে দেওয়া বিষয়। যাঁরা রাষ্ট্রকেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাসী তাঁদের নিকট জাতি-রাষ্ট্র কেন্দ্র কর্তৃক সংস্কৃতিকে নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ করাটাই স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক এঁদের মতে ধ্রুপদী সংস্কৃতির অযৌক্তিক উপাদানগুলিকে রাষ্ট্রের দূর করা প্রয়োজন। এঁরা আধুনিকীকরণের নামে সংস্কৃতির উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সমর্থক। কেবল মাত্র তাই নয়, এঁরা সাংস্কৃতিক ..... অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক এবং প্রাচীনপন্থী বলে সমালোচনা করেন। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আশিস নন্দী সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীকেই সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী মনে করে রাষ্ট্র হল সমাজ এবং সংস্কৃতিরই অংশ। রাষ্ট্র হল সংস্কৃতিক রক্ষক, ধারক এবং বাহক। কিন্তু রাষ্ট্রকেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গীকে রাষ্ট্রের দ্বারা সভ্যতা ধ্বংসের সম্ভাবনা থেকে যায়। আধুনিকীকরণের নামে সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ অনেক সময় জাতি ধ্বংসকারী (ethnocident) পদক্ষেপ হতে পারে বলে আশিস নন্দী অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আশিস নন্দী ভারতের ১৫০ বছরের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছেন যে গত ১৫০ বছর ধরে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ 'State oriented approach to culture'-কে অনুশীলন করেছে। তাঁর মতে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই পশ্চিমী দেশগুলিতে জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভব সেখানকার ধ্রুপদী সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। পশ্চিমী পণ্ডিতরাও জাতি-রাষ্ট্রের সর্বজনীন নীতির নিরিখেই সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন করেছে। এই কারণে তাঁর বিকল্প পথটি ভুলে গেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমগ্র বিশ্বে রাজনীতির পরিভাষতে যেহেতু একই প্রকার হলে গেছে, তাই রাষ্ট্র কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গীকেই সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করার একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ১৯৫০-এর দশকে পশ্চিমে উদ্ভাবিত রাজনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব উত্তর-ঔপনিবেশীক রাষ্ট্রগুলির সংস্কৃতিকে দেখেছে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের বিরোধী হিসাবে। এই কারণে পশ্চিমী উন্নয়ন তত্ত্বের সমর্থকরা এশিয়া ও আফ্রিকার স্থানীয় সংস্কৃতিকে উন্নয়ন বিরোধী তকমা দিয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তা সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করেন। আশিস নন্দী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ১৯৫০-এর দশকে পশ্চিমী এবং ভারতের বৌদ্ধীক চর্চায় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রকেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ঐ সময় আর্থিক প্রবৃদ্ধির উপর সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন। ঐ সকল গবেষণার প্রধান অনুমান ছিল সংস্কৃতির লক্ষ্য হল আর্থিক প্রবৃদ্ধি করা। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ মনে করতেন যে সংস্কৃতির যে সকল উপাদান আর্থিক প্রবৃদ্ধিকে বাধা দেবে সেই উপাদানগুলি বাতিল করা প্রয়োজন। তাছাড়া তাঁরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্থবিরতাপ্রাপ্ত সংস্কৃতিকে দূর করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক আধুনিক সংস্কৃতির প্রবর্তনের কথা বলেন। ঐ সকল আলোচনায় দাবি করা হয় যে অপশ্চিমী বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের প্রধান কারণ এখানকার ধ্রুপদী সংস্কৃতি। এমনকী বিভিন্ন গবেষণায় অ-পশ্চিমী দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করার জন্য সেখানকার সংস্কৃতির মধ্যে প্রোটেস্টান্ট নীতি যা পশ্চিমের পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করেছিল, সেই সকল নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া মার্কসবাদীদের আলোচনায় ও অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদকে প্রাধান্য দিয়ে সংস্কৃতিকে গুরুত্বহীন করা হয়েছে। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, ১৯৫০-এর দশকের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক আলোচনায়ও সমাজের সংস্কৃতিকে আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষে উপযোগী করে গড়ে তোলার কথা বলা

হয়। এর জন্য অ-আধুনিক সাংস্কৃতিক উপাদনগুলিকে আরো বেশী যৌক্তিক এবং আধুনিক করে গড়ে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিভিন্ন চিন্তাবিদ আধুনিক বিজ্ঞানের স্বার্থে ধ্রুপদী সংস্কৃতির বিভিন্ন অযৌক্তিক উপাদানের সংস্কারের দাবি তোলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণের থেকে সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন করার ফলে বিভিন্ন জনজাতির ধ্রুপদী সংস্কৃতির উপর আঁধার নেমে আসে। আশিস নন্দী মনে করেন অর্থনীতি এবং বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রেই জাতি-রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা হয় সাংস্কৃতিক পুনর্নির্মানের ক্ষেত্রে। নন্দী ঔপনিড়বেশীক শাসন কাল থেকে শুরু করে ১৯৬০-এর দশকের অধিকাংশ ভারতীয় রাজনীতিবিদকে 'রাষ্ট্রবাদী' বলে অভিহিত করেছেন। যাঁরা পশ্চিমী আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে দেশের সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইওরোপীয় এবং ভারতীয় আধুনিককতাবাদীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আশিস নন্দীর মতে সংস্কৃতি এবং আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রের উপর গুরুত্ব আরোপের ইতিহাস ভারতে শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। সংস্কৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রকেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতে এসেছে ঔপনিবেশবাদের মাধ্যমে। উপনিবেশবাদের প্রভাবে ভারতের হিন্দু নেতৃবৃন্দ হিন্দু-ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনর্নির্মান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করেন। আশিস নন্দীর মতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে হিন্দু ধর্ম এবং সমাজ সংস্কারকরা এটা উপলব্ধী করেন যে খ্রীষ্টান ধর্ম এবং ইসলাম রাষ্ট্রকে যে পরিসর দেয়, তা হিন্দু ধর্মে অনুপস্থিত। এমনকী, ভারতের হিন্দুরা জাতি-রাষ্ট্র সম্পর্কেও অনাগ্রহী। আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের সাথে হিন্দু সংস্কৃতিকে মানানসই করার জন্য হিন্দু সংস্কারকরা হিন্দুদের সংস্কৃতি এবং জীবন-যাপনের ধরণকে সংস্কার করা শুরু করেন। তাঁরা যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন সে আপাত দৃষ্টিতে ছিল হিন্দুধর্মকে ইসলাম এবং খ্রীষ্টান ধর্মের আঘাত থেকে রক্ষা করার একটি প্রয়াস। কিন্তু এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতের সমাজ-জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পথকে সুগম করে দেয়। এভাবে হিন্দু ধর্মের মধ্যে আধুনিক রাষ্ট্রবাদ প্রবেশ করে। হিন্দু নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতের যে হিন্দু-রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন তা অতীতের কোনো হিন্দু-রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়। তা হল ব্রাহ্মণ্যবাদী নীতির উপর গড়ে ওঠা এক আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা। সাভারকার-এর মত হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা যাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বৈপ্লবীক আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরা ইসলামের আধিপত্য থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে 'উন্নত' ব্রিটিশদের সাহায্য নেওয়ার চিন্তা করেন। অন্যভাবে বলা যায় যে ভারতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনবাদের মডেলটি ছিল পশ্চিমী।

আশিস নন্দী ভারতের মসাজ এবং সাংস্কৃতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ইতিহাসে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রথম প্রজন্মের সংস্কারকরা কেবলমাত্র ভারতীয়দের রাজনীতিতে অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণের দাবিই তোলেন নি, তাঁরা সমাজ জীবনে রাষ্ট্রেরও হস্তক্ষেপের দাবি তোলেন। তা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে তাঁরা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে অনিয়ন্ত্রীত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ চান নি। তবে রে কারণ ছিল ঐ সময় ভারতের রাষ্ট্র মন্ত্রটি ছিল বিদেশী শাসকদের হাতে। এমনকী, প্রথম দিকের ভারতের ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রীত রাষ্ট্র ব্যবস্থাটির আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না। এটি ছিল ঔপনিবেশিক শোষণের হাতিয়ার। প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতীয়দের ধর্ম এবং সমাজ সংস্কারের প্রতি কোনো আগ্রহ দেখান নি। এক্ষেত্রে ভারতীয়রাই সমাজ এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি জানায়। এই মানসিকতাই ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাষ্ট্রকেন্দ্রীক মানসিকতার বীজ বপন করে।

আশিস নন্দীর মতে প্রথম প্রজন্মের সমাজ সংস্কারকদের ভাবনার উপর ভিত্তি করেই জাতি-রাষ্ট্রের প্রতি দ্বিতীয় প্রজন্মের সমাজ সংস্কারকদের আগ্রহ গড়ে ওঠে। ইওরোপীয় জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাকে আঁকড়ে ধরার ফলে রাষ্ট্র নেতারা তৃণমূল স্তরের রাজনীতিকে সন্দেহের চোখে দেখেন। আশিস নন্দীর আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা তত্ত্বগতভাবে গণ-রাজনীতির কথা বললেও বাস্তবে তাঁরা বিপুল সংখ্যক দেশবাসীকে আধুনিক রাজনীতির জন্য অনুপোযুক্ত বলে মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন হিন্দুরা সেদিন আধুনিক শিক্ষায়

শিক্ষিত হবে সেই দিনই তাঁরা রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এই মানসিকতার জন্যই তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল ভারতীয়র অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে পারে নি। আধুনিক হিন্দুত্ববাদীরা ইওরোপের জাতি-রাষ্ট্রের মডেলকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। এর ফলে তাঁরা সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রকেন্দ্রীক রাজনীতির জন্য অপরিণত বলে বিবেচনা করে। তাঁরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে হিন্দু-ব্যক্তিত্বের এবং সংস্কৃতির দূর্বলতাগুলি দূর করার কথা ভাবেন। আশিস নন্দীর মতে অধিকাংশ সমাজ সংস্কারক যাঁদের হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী বলা হয় তাঁদের ব্রিটিশ শাসন বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন থাকলেও, সকল ভারতীয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রশ্নে তাঁদের অনীহা লক্ষ্যনীয়। এমনকী গ্রামে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সম্পর্কে তাদের ভীতি ছিল। নন্দীর মতে হিন্দু-রাষ্ট্রের কথা হিন্দুত্ববাদীরা ভাবলেও রাজনীতিতে সকল হিন্দু প্রজার অংশগ্রহণ নিয়ে তাঁরা কোনো উৎসাহ দেখান নি। এমনকী ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবীরাও অতীত ভারতের হিন্দুদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করে সেই ঐতিহ্যকে পুনঃস্থাপিত করার নামে জাগ্রত হিন্দু সংস্কৃতিকে সংস্কারের চিন্তা করেছেন। আশিস নন্দীর মতে এঁরা পশ্চিমী আধুনিক সভ্যতা, পশ্চিমী খ্রীষ্টান ধর্ম এবং মধ্য এশিয়ার ইসলামের গুণগ্রাহী ছিলেন। এর কারণ হল এই সকল অঞ্চলের মানুষের সাহসিকতা এবং তাঁদের বীরত্ব। তাঁরা মনে করতেন অতীত ভারতে এই সকল গুণাবলী উপস্থিত ছিল। সেকারণে অতীতকে ফিরিয়ে আনার নামে তাঁরা গ্রামীণ ভারতের সংস্কৃতির প্রবল সমালোচক ছিলেন। নন্দী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে আধুনিক ভারতীয়রা উনবিংশ শতাব্দীর যে সকল সংস্কারকদের পুনরুজ্জীবনবাদী বলে মনে করতেন, তাঁরা কেউ পশ্চিমী সভ্যতা কিংবা ইসলাম বিরোধী ছিলেন না। এঁরা ভারতের প্রেক্ষিতে ছিলেন ব্রিটিশ এবং মুসমিল বিরোধী। কিন্তু তাঁদের আদর্শ ছিল পশ্চিমী খ্রীষ্টান ধর্ম এবং পশ্চিম এশিয়ার ইসলাম। নন্দীর মতে এঁরা মূলত ছিল হিন্দু বিরোধী। এঁদের নিকট হাজার বছর পূর্বের মৃত হিন্দুরা ছিল ভালো। আর জীবিত হিন্দুরা হল ত্রুটিযুক্ত। কারণ এরা আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপোযুক্ত।

আশিস নন্দীর মতে রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক ভারতের মূল স্রোতের উদারনৈতিক এবং মার্কসবাদী ভাবন উপরি উক্ত মতাদর্শগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রবাদীদের ধারণআ হল সংস্কৃতিকে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের অনুকূলে গড়ে তুলতে হবে। এঁরা সর্বদাই এঁদের ভাবনার স্বপক্ষে রাজা রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদাহরণ টানেন। কিন্তু রামমোহন এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পশ্চিমী আধুনিক সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। আশিস নন্দীর মতে রামমোহন রায় ভারতীয়দের ব্যক্তিত্ব এবং সংস্কৃতির সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করেছেন ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির মধ্যে, হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে নয়। তিনি ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা প্রবর্তিত প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলিকে ভারতের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী করেছেন। এমনকী, তিনি গ্রামীন ভারতের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। তিনি যে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল সনাতনী হিন্দু, ঐতিহ্য, পশ্চিমী ধর্মীয় ঐতিহ্য নয়। নন্দীর মতে রামমোহন রায় কখনো চাননি ভারতীয় সংস্কৃতিকে আধুনিক সনাতন মাপে সম্পৃক্ত করতে। পক্ষান্তরে তিনি আধুনিকভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। রামমোহন রায়ের ভাবনার মধ্যে বেলাগাম আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধে এক প্রকার ধাঁধার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের আধুনিকতাবাদীরা যাঁরা পশ্চিমী সকল কিছুর অন্ধ ভক্ত ছিলেন তাঁরা রামমোহন রায়কে ভারতীয় আধুনিকতার পিচাস পরিনত করেছেন। জাতি-রাষ্ট্র এবং ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে ভারতের আধুনিকতাবাদীদের মতাদর্শগত ভিত্তিটি প্রদান করেছিলেন ভারতের হিন্দু জাতীয়ভাবধারা যাঁরা ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উর্ধ্বে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রকে স্থান দিয়েছেন।

আশিস নন্দী ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কেন্দ্রীক ধারনার বাইরে একটি ভিন্ন ধারার অনুসন্ধান করেছেন। এই বিকল্প ধারাটি সমাজের প্রয়োজনীয়তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। এই ধারাটি রাষ্ট্রকেন্দ্রীক রাজনীতিকে ভারতের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিরোধী বলে মনে করে। আশিস নন্দী গান্ধীর ভাবনার মধ্যে

এই বিকল্প ধারাটি খুঁজে পেয়েছেন। গান্ধী সর্বদাই কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের ধারনার বিরোধী ছিলেন। রাষ্ট্রের উর্ধ্বে তিনি সমাজ এবং সভ্যতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। রাষ্ট্রের পরিবর্তে তিনি সর্বোদয় সমাজের চিন্তা করেছেন। গান্ধী আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র এবং রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁর ভাবনাকে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের রাজনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। নন্দীর মতে মতাদর্শগত দিক থেকে ঐ সকল মেকি গান্ধীবাদীরা গান্ধী-হত্যাকারী নাথুরাম ব্রাডসে্-এর ভাবনার কাছাকাছি। ব্রাডসে-কে সাধারনত অতি-রক্ষণশীল বলে মনে করা হয়। একজন অতি রক্ষণশীলের শত্রু হওয়ার কথা একজন অতি-আধুনিক, গান্ধীর মত একজন ঐতিহ্যের অনুরাগনী নন। আশিস নন্দীর মতে রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্কের এই বিকল্প ভাবনা আধুনা নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ভারতের সনাতনপন্থী, আধুনিকতা বিরোধী, উত্তর-মাওবাদী মার্কসবাদী এবং নয়া-গান্ধীবাদী পণ্ডিত এবং গবেষকদের চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে। এঁরা আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র এবং ক্ষমতার রাজনীতির উর্ধ্বে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্থান দিয়েছেন। এঁরা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের প্রকৃতির মূল্যায়ন করেছেন। এই বিকল্প ভাবনাকেই আশিস নন্দী "Culture oriented apporach to the state" বলে উল্লেখ করেছেন। নন্দী এই দৃষ্টিভঙ্গীর কতগুলি দিক তুলে ধরেছেন :

প্রথমত, এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকরা রাষ্ট্র ব্যবস্থার উর্ধ্বে সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে গুরুত্ব প্রদান করেন। এবং রাষ্ট্রকে দেখেন সভ্যতার হাতিয়ার হিসাবে। এঁদের দাবি হল সভ্যতা সংস্কারের পূর্বে রাষ্ট্রের সংস্কার। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন কিংবা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুরুটা হওয়া প্রয়োজন ইঙ্গ-ভারতীয় সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। আশিস নন্দীর মতে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী জগৎ সম্পর্কে কর্তৃত্ববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে শোষিতদের দৃষ্টিভঙ্গীকে গুরুত্ব দেয়। আধুনিক সংস্কৃতির যৌক্তিকতা এবং সর্বজনীনতার পরিবর্তে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী দীর্ঘ লালিত লোক সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দেয়।

দ্বিতীয়ত, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহ্যকে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার বলে মনে করে। মূলতঃ প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত থাকে নিজস্ব বিজ্ঞান (ethnic science) এবং প্রযুক্তি। আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাই এই দেশীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। আধুনিক বিজ্ঞান রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে সনাতনী জ্ঞানকে ধ্বংস করে দেয়। উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের জীবন-জীবিকার উপর তীব্র আঁঘাত নামিয়ে আনে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রীত প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ধ্রুপদী বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে 'অযৌক্তিক' আখ্যা দিয়ে তাদের সমাজ থেকে অপসারিত করে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক বিজ্ঞানের এই আগ্রাসী চেহারাটি প্রকাশ্যে আনে।

তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কৃতিকে দেখে ধ্রুপদী লোক্, অতীত-বর্তমান, এবং জীবিত-মৃতের এক দ্বান্দ্বিকতা হিসাবে। অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্র ধ্রুপদীকে শ্রদ্ধা করার নামে অতীতের সংস্কৃতিকে যাদুঘরের বিষয়ে পরিণত করে। আধুনিক রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাঁরা সংস্কৃতিকে দেখে তাঁরা লোকসংস্কৃতির দৈনন্দিন ব্যবহারকে অবজ্ঞা করে একে কেবলমাত্র নান্দনিকতার স্তরে নামিয়ে আনে। এর ফলে ethnic arts এবং লোক-সঙ্গীত ধনী ব্যক্তিদের বিলাসিতায় পরিণত হয়।

চতুর্থত, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী জাতীয় নিরাপত্তাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে। নন্দীর মতে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকরা যদিও যৌথ নিরাপত্তার বিরোধী নয়, তবুও রাষ্ট্রবাদীরা এঁদের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক বলে মনে করে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ এটা সন্দেহ করে যে ভারত ক্রমাগত জাতীয় নিরাপত্তার রাষ্ট্রে পরিনত হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকরা আরো মনে করেন যে নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং আধুনিক বিজ্ঞান—রাষ্ট্রের এই তিন যৌক্তিকতার নামে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এক প্রকার উপনিবেশবাদ তৈরী হচ্ছে। আধুনিকীকরণের দ্বারা সর্বাধিক লাভবান হচ্ছে এলিটরা আর এর দ্বারা নিষ্পেষিত ও শোষিত হচ্ছে দরিদ্ররা। আশিস নন্দীর মতে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সংস্কৃতি তৈরী করা হচ্ছে সেখানে ধনী এবং ক্ষমতাবানদের কুসংস্কারকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় দরিদ্র মানুষের কুসংস্কারকে। বিজ্ঞানমনস্কতার দোহাই দিয়ে দরিদ্র মানুষের মধ্যে কুসংস্কার দূর করার নামে তাঁদের উপর অনেক সময় আঘাত হানা হয়। তথাকথিত আধুনিক

বিজ্ঞানীরা উদারনীতিবাদী এবং প্রগতিশীলরা জ্যোতিষ শাস্ত্রকে যেভাবে আক্রমণ করে সেভাবে তাঁরা অস্ত্র ব্যবসায়ীদের এবং ভ্রান্ত বিজ্ঞাপন যুক্ত পন্য সামগ্রীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না। এক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান কুসংস্কারকেই বাহবা দেয়।

পঞ্চমত, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রের থেকে সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিলেও রাষ্ট্র সম্পর্কে এর কোনো তত্ত্ব নেই তা নয়। তবে রাষ্ট্র সম্পর্কে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর তত্ত্বটি অ-আধুনিক। আশিস নন্দীর মতে এই তত্ত্বটিকে রাষ্ট্রবাদী রাজনীতির এক বিকল্প তত্ত্ব বলা যেতে পারে। নন্দী আধুনিক রাজনীতির একটি কুসংস্কারমূলক দিকের প্রতি সৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটি হল রাষ্ট্রবাদীরা মনে করে যে একমাত্র আধুনিক রাজনীতিবিদরাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতা, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিরাপত্তার বিষয়, জাতীয় সংহতি এবং সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতি রক্ষার মত জটিল বিষয়গুলি যোগ্যতার সাথে নির্বাহ করতে পারে। এই কারণে এরা ভিন্ন ধর্মী রাজনীতিকে সন্দেহের চোখে দেখে। এই রাষ্ট্রকেন্দ্রীক রাজনীতির বাইরে যাঁরা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে রাজনীতিকে দেখেন তাঁরা রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের তত্ত্বগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখেন। এঁরা রাষ্ট্র সম্পর্কে "bottom-up" মডেলে বিশ্বাসী। রাজনীতির ক্ষেত্রে এরা তৃণমূল স্তরের সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে গুরুত্ব দেন। এই বিকল্প রাজনীতির লক্ষ্যে আধুনিক রাজনীতির মত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখন নয়। এর লক্ষ্য হল স্থানীয় ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা। অ-আধুনিক রাষ্ট্র তত্ত্ব জাতি-রাষ্ট্রের তত্ত্বের মত এক ভাষা, এক ধর্ম অথবা এক সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী নয়। এই তত্ত্ব ভারতের সংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলে। আধুনিক হিন্দুত্ববাদীদের জাতি-রাষ্ট্রের ধারনার উর্ধ্বে উঠে এঁরা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি confedenation-এর ধারণা ভুলে ধরেন, সেখানে প্রতিটি ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ভাষার মানুষ পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতার পরিবেশে বাস করবে। রাষ্ট্র সম্পর্কে এই সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে উপনিবেশবাদী মানসিকতার বিরোধী।

ষষ্ঠত, আশিস নন্দীর মতে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রকেন্দ্রীক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করে। পূর্বে এই পার্থক্যটি করেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ন। তিনি রাজনীতি এবং লোকনীতির মধ্যে পার্থক্য করে ক্ষমতার রাজনীতির ঊর্দ্বে লোকনীতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী রাজনীতির পরিবর্তে লোকনীতিতে বিশ্বাসী। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, এবং তৃণমূল স্তরের মানুষদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি যথার্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী গুরুত্ব দেয়।

রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক দিয়ে আশিস নন্দীর এই ভাবনা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে তিনি আধুনিকীকরণের নামে সংস্কৃতির উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাভাবনার উপর গান্ধীর ভাবনার প্রভাব সুস্পষ্ট। গান্ধীর ও পশ্চিমী সভ্যতার সমালোচনার মধ্যে দিয়ে ভারতের সনাতনী সংস্কৃতিকে বৈধতা দিয়েছেন। আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী প্রকৃতি অনুধাবন করে গান্ধী রাষ্ট্রহীন সর্বোদয় সমাজের মডেল নির্মাণ করেছেন। তবে আশিস নন্দী সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে মান্যতা দিলেও তিনি কোনো রাষ্ট্রহীন সমাজের কথা বলেন নি। তিনি কোন জাতি-রাষ্ট্রের সংস্কৃতির কর্তৃত্ববাদী দিকটির সমালোচনা করেছেন।

৩.৪ ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে সুদীপ্ত কবিরাজের বিশ্লেষণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে সুদীপ্ত কবিরাজের ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় গণতন্ত্র এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক রজনী কোঠারীর বিশ্লেষণ খণ্ডন করার মধ্যে দিয়ে। একথা সত্য যে ভারতীয় রাজনীতির বিস্ময় হল পশ্চিমী গণতন্ত্রের সাফল্যের অধিকাংশ শর্তগুলি ভারতে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরে ভারতের গণতন্ত্র টিকে থাকা। তাত্ত্বিক দিক থেকে চিরাচরিত রাজনৈতিক তাত্ত্বিক এবং মার্কসবাদীরা উভয়েই গণতন্ত্র সম্পর্কে সন্দীহান। মার্কসাবাদীরা যখন ভারতের গণতন্ত্রের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁরা এক প্রকার তাত্ত্বিক

সংকটে পরেন। এটি হল উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য যে বুর্জোয়া সমাজ এবং পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা প্রয়োজন তা ভারতে ছিল না। ঐতিহাসিকদের আধুনিক গণতন্ত্রের সাথে কতকগুলি অর্থনৈতিক শর্ত যুক্ত। পশ্চিম ইওরোপে যখন পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র যখন সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে তখনই সেখানে গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাই ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রকে স্থায়ীত্ব দিয়েছে। কিন্তু ভারতে এই শর্তটি আংশিকভাবে পূরণ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ভারতের গণতন্ত্রের সাফল্যের কারণ অনুসন্ধানের জন্য অনেকে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রজনী কোঠারী। কোঠারী ভারতের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। এক্ষেত্রে রজনী কোঠারীর মূল বক্তব্য হল :

(১) ভারতের সনাতনী সমাজ ব্যবস্থায় বহুত্ববাদী জীবন ধারা লক্ষ্যণীয়। কোঠারীর মতে প্রকৃতিগতভাবেই ভারতের সংস্কৃতি বহুত্ববাদী। ভারতের ঐক্য সংস্কৃতিক, রাজনৈতিক নয়। ভারতের সনাতনী রাজনীতির মধ্যে সহিষ্ণুতা না থাকলে ও সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতার ধারা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতার ঐতিহ্যই ভারতীয় গণতন্ত্রকে টিঁকে থাকতে সাহায্য করেছে।

(২) স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও বহুত্ববাদ ?এবং সহিষ্ণুতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া স্বাধীন ভারতে রাজনৈতিক এলিটদের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ হয়েছে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের অনুপস্থিতি এবং নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে গণতান্ত্রিক প্রকৃতিসম্পন্ন করে তুলেছে।

(৩) কে. কোটারীর দাবি হল বহুত্ববাদ এবং সহিষ্ণুতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিঁকে থাকার কারণ এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিরোধী নয়।

রজনী কোঠারীর প্রধান যুক্তি হল ঐতিহ্যবাহী ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে যে বহুত্ববাদ এবং সহিষ্ণুতার উপাদান ছিল তা আধুনিক ভারতের গণতন্ত্রকে টিঁকে থাকতে সাহায্য করেছে। রজনী কোঠারীর এই বক্তব্যের সাথে সুদীপ্ত কবিরাজ সহমত প্রকাশ করেননি। তাঁর আপত্তির জায়গা হল কোঠাকীর 'সনাতনী সমাজ'-এর ধারণা নিয়ে। ভারতের সনাতনী সমাজ বলতে কোঠারীর 'সনাতনী সমাজ'-রে ধারণা নিয়ে। ভারতের সনাতনী সমাজ বলতে কোনো সমরূপ সমাজকে বোঝায় না। কবীরাজের বক্তব্য হল সমনি আমরা সনাতনী সমাজ কথাটি ব্যবহার করব তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতের বিচিত্র প্রান্তের সমাজ ব্যবস্থা বিচিত্র প্রজার ছিল এবং তারা সর্বদাই সহিষ্ণু সমাজ ছিল তা নয়। ভারতের বিচিত্র প্রান্তের সনাতনী সমাজে নমনীয়তা এবং কঠোরতা দুই ছিল। তাছাড়া ভারতের সনাতনী সমাজ বলতে প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক , মধ্যযুগীয় এবং ঔপনিবেশিক বিভিন্ন সমাজ বোধকে বোঝানো যায়। এই সমাজগুলি আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ থেকে পৃথক। প্রাক্-আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ থাকলেও সহিষ্ণুতাও ছিল, এবং একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাছাড়া অতীত ভারতে কোনো একক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না। ভারতের বিচিত্র অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার শাসনতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। কবিরাজের মতে ভারতের পরিচিতি সাংস্কৃতিক। উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতে দুই প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উভয় প্রান্তের সমাজের মধ্যে সমরূপতা রয়েছে। কিন্তু এই সমরূপ পরিচিতিটি অ-রাজনৈতিক। এই অ-রাজনৈতিক গুণটি কিভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়েছে তা বোঝা কষ্টসাধ্য। তাছাড়া সুদীপ্ত কবিরাজ মনে করেন যে গণতন্ত্রের জন্য যে বহুত্ববাদ প্রয়োজন আর সনাতনী ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদ এক প্রকার নয়। তাছাড়া প্রাক্-আধুনিক ভারতে সাংস্কৃতিক দিক থেকে বহুত্ববাদ থাকলেও সেখানে সহিষ্ণুতা ছিল, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। গণতন্ত্রের জন্য যে ধরনের সহিষ্ণুতা প্রয়োজন তা ভারতের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিরাজমান তা বলা যায় না। তাছাড়া ও কবিরাজ আরো অভিমত প্রকাশ করেছেন যে গণতন্ত্রের জন্য যে ধরনের বহুত্ববাদ প্রয়োজন আর ভারতের মধ্যযুগের বহুত্ববাদ এক বিষয় নয়।

সুদীপ্ত কবিরাজের মতে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলতে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে একটি গুণগত সম্পর্ক বোঝায়। সমগ্র শাসন

ব্যবস্থায় থাকবে আলাপ-আলোচনার পরিবেশ, প্রশাসন হবে দায়বদ্ধ, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শাসন করবে, নাগরিকদের কতকগুলি বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি থাকবে এবং সর্বোপরি শাসকের ক্ষমতা হবে নিয়ন্ত্রিত। এই সকল গুণাবলীর কোনটাই ভারতের সনাতনী সমাজের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় না। একথা ঠিক যে প্রাচীন ভারতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকলেও গণতন্ত্র ছিল না। এমনকী সচেতন এবং যৌক্তিক সহিষ্ণুতাও ছিল না। কবিরাজের মতে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি গণতান্ত্রিক প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল না। অতীত ইতিহাসের প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে যে এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের জীবন-যাপনের ধারাকে অন্য সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সাংস্কৃতিক বহুত্বতা থাকলেও সহিষ্ণুতা ছিল দুর্বল প্রকৃতির। কবিরাজের মতে ভারতের সনাতনী সংস্কৃতি ছিল আভিজাততান্ত্রিক, দমন-পীড়নমূলক এবং শোষিতদের প্রতি হিংসাত্মক। তাছাড়া একটি সমাজের সাংস্কৃতিক বহুত্বতার মধ্যে অযৌক্তিকতা ও থাকতে পারে। যেমন হিন্দু সমাজের জাত-ব্যবস্থা। বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে আচার-আচরণ এবং সংস্কৃতি ভিন্ন প্রকার। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে হিংসা। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেও বৈচিত্র্য রয়েছে। ভারতের বিভিনন প্রান্তের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় যে এক অন্যের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে মর্যাদাও দিত। যেমন উত্তরবঙ্গে যখন সতীদাহ হত দক্ষিণবঙ্গের হিন্দুরা সেই অনুষ্ঠানকে সহ্য করত। দক্ষিণ ভারতের দেবদাসী প্রথাকে ভারতের অন্য প্রান্তের হিন্দুরা মেনে নিত। সমগ্র ভারতে ধর্মের নামে হরিজন নিপীড়ন সমস্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ মেনে নিত। এটাও এক প্রকার সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ এবং সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত। কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য যে বহুত্ববাদ এবং সহিষ্ণুতা প্রয়োজন তা ভিন্ন প্রকার। এখানে প্রয়োজন ভিন্ন মতকে মর্যাদা দেওয়া। জাত ব্যবস্থা সম্পর্কে হরিজন এবং সতীদাহ সম্পর্কে হিন্দু নারীদের মতামত নেওয়া হলে তবেই তা হত সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদী সমাজ। সুদীপ্ত কবিরাজের মতে এধরনের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ভারতের সনাতনী সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া পরমত এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতার ইতিহাসও ভারতে দুর্বল প্রকৃতির। হিন্দুদের দ্বারা বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস এবং মুসলীমদের দ্বারা হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে ভারতে পরমত সহিষ্ণুতার ইতিহাসটি গৌরবজনক নয়। হিন্দুদের অত্যাচারেই বৌদ্ধ ধর্মকে ভারত ছাড়া হতে হয়েছিল। গণতন্ত্রের জন্য যে ধরনের সহিষ্ণুতা প্রয়োজন তা হল শক্তিশালীর সহিষ্ণুতা, শক্তিহীনের সহিষ্ণুতা নয়। যখন কোনো গোষ্ঠীর অন্য গোষ্ঠীর উপর নিজের সংস্কৃতি এবং মতামত চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করে না এবং অন্যের মত এবং সাংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার সাথে দেখে, সেই ধরনের সহিষ্ণুতাই যথার্থ সহিষ্ণুতা যা গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন। এই ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভারতের সনাতনী ঐতিহ্যে খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য। কবিরাজের এই বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় যে ভারতের সনাতনী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গণতন্ত্রের জন্য অনুকূল নয়।

সুদীপ্ত কবিরাজ স্বাধীন ভারতের রাজনীতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক উপাদানের অনুসন্ধান করেছেন। রজনী কোঠারী ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বহুত্ববাদী এবং সহিষ্ণুতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বলে দাবি করেছেন। তাঁর মতে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সহমতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থ গোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা এবং দরকষাকষির মাধ্যমে গৃহীতহয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নীতি হল আলাপ-আলোচনা এবং দরকষাকষির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কিন্তু বাস্তবে এই নীতিটির কার্যকারিতা ভারতে সীমাবদ্ধ। কারণ সংসদে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আলাপ-আলোচনা এবং বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলেও শাসক দল বিরোধী দলগুলির মতামতকে কতটা মর্যাদা দেয় তা নির্ধারণ করা রীতিমত গবেষণার বিষয়। তাছাড়া অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে বিরোধী দলে কেবলমাত্র বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা করে। এই কারণে ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি একটি সহমত ভিত্তিক ব্যবস্থা একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় না। তাছাড়া ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক এবং অসহিষ্ণুতামূলক উপাদানও সক্রিয়। সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা এবং ভাষা সংক্রান্ত আধিপত্য ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুদীপ্ত কবিরাজ ১৯৮০-এর দশকের ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক এবং অসহিষ্ণুতামূলক উপাদানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঐ সময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জাত-পাতের তীব্রতা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে প্রশাসন যন্ত্রও এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিন্ন জাতের মানুষের প্রতি পুলিশ-প্রশাসনের দুর্ব্যবহার ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসায় প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের নজিরও কম নয়। গণতন্ত্রের জন্য যে ধরনের সহিষ্ণুতা প্রয়োজন তার উপস্থিতি যে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কম, তা স্বাধীনোত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংগঠিত দাঙ্গার ইতিহাসের দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায়।

কবিরাজের মতে গণতন্ত্র হল সকলের জন্য কেটি সমঅধিকারের ব্যবস্থা। কিন্তু বাস্তবে সংবিধানে ঘোষিত অধিকার ভারতে সকলে সমভাবে ভোগ করতে পারে না। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যৌক্তিকতার দিক থেকে গৃহীত হয়। অর্থাৎ গণতন্ত্রের মধ্যে যুক্তিবোধ সক্রিয়। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং এক নায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মূলত অযৌক্তিক শাসনব্যবস্থা। কিন্তু বাস্তবে গণতন্ত্রের মধ্যেও অযৌক্তিকুপাদান সক্রিয় থাকে। সুদীপ্ত কবিরাজের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলা যায় যে ১৯৭০-রে দশকে ভারতের গণতন্ত্রের নিকট সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি। কবিরাজ ইংল্যান্ডের গণতন্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে কীভাবে সেখানকার সামন্ততাত্রিক শক্তি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেবলমাত্র সামন্তপ্রভুরাই নয়, ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীও সর্বহারাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। এখানে গণতন্ত্রের উত্থান ঘটেছিল মূলতঃ বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে। জনগণের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার। কবিরাজের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলা যায় যে ভারতের গণতন্ত্রিকরণের প্রক্রিয়াটি অসম্পূর্ণ। ভারতের বুর্জোয়ারা জাতীয় সমাজতন্ত্রের পথকে সমর্থন করে। অন্যদিকে, গ্রামের জমিদার এবং ধনী কৃষকরা সমান্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে। এই দুই শক্তিই গণতন্ত্র বিরোধী। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ব্রিটিশ সরকার ভূমি সংস্কার এবং বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ এবং অগণতান্ত্রিক শক্তিকে সুরক্ষিত করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও দীর্ঘকাল ঐ শক্তি সক্রিয় ছিল। গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ এবং সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির অবসান ঘটানো। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জমিদারী এবং জোতদারী ব্যবস্থাই ছিল সামন্ততন্ত্রের সাফল্যের অন্তরায়।

ইওরোপের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষ গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর মাধ্যমে। আর ভারতে ১৯৮০-এর দশ পর্যন্ত সামন্তপ্রভুরাই ছিল গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রধান কারক। ভারতের জোতদার জমিদাররা গণতন্ত্রকে কৌশলগতভাবে গ্রহণ করে। এঁরা ভোটের রাজনীতির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে নিজেদের সনাতনী ক্ষমতাকে বৈধতা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যেত গ্রামের জোতদার জমিদাররাই গ্রমপঞ্চায়েতের প্রধান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কংগ্রেসের এম.পি. এবং এম.এল.এ-দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল জমিদার শ্রেণীর মানুষ। পরবর্তীকালে এঁদের স্থান গ্রহণ করে ধনী কৃষক শ্রেণী যাঁরা কংগ্রেসের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক নীতির দ্বারা পুষ্ট হয়ে ওঠে। এঁরা যে ছলে-বলে-কৌশলে কৃষি জমির ঊর্ধ্ব সীমা আইন লঙ্ঘন করে তা নয়, গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির উদ্ভবকে বাঁধা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁরা হল হিন্দু সমাজের উচ্চ এবং মধ্যবর্তী জাতের মানুষ। এঁরা গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র কৃষকের শোষক হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামাঞ্চলে নিম্ন জাতের মানুষদের উৎপীড়ন এবং ভোট যন্ত্রকে ব্যবহার করে গ্রামে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করাই এঁদের লৗ্য হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘকাল এই শক্তি ছিল ভারতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিপন্থী। কবিরাজ ভারতের রাজনৈতিক বা সংস্কৃতির দুটি প্রকারের উল্লেখ করেছেন। ভারতের শহরাঞ্চলের সংস্কৃতি গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক হলেও গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে হিংসা এবং অসহিষ্ণুতা তা গণতন্ত্রের পথে সহায়ক নয়। এর সাথে রয়েছে শাসক শ্রেণীর সংগঠিত হিংসা।

রজনী কোঠারী ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দরকষাকষির ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কোনো নীতি নির্ধারমের

সময় বিভিন্ন গোষ্ঠী আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এবং সহকারী নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন গোষ্ঠী আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় বলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা। সুরক্ষিত থাকে। সুদীপ্ত কবিরাজ কোঠারীর এই বক্তব্যটি মেনে নিয়েও যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি করেছেন তা হল : যেহেতু প্রতিটি গোষ্ঠীর শক্তি সমান নয় তাই দরকষাকষির মাধ্যমে সকলে সমানভাবে সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে না। যেমন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক এবং সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের দরকষাকষির শক্তি সমান নয়। ধনী কৃষকরা সরকারের কৃষি নীতিকে প্রভাবিত করতে পারলেও ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকরা তা পারে না। আবার বড় শিল্পপতিরা সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করতে পারলেও ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকরা তা পারে না।

একথা সত্য যে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সহিষ্ণুতা। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস সরকারের সহিষ্ণুতার নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ক্ষমতাকে টিঁকিয়ে রাখা। কংগ্রেস ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সর্বস্বার্থের সমন্বয়কারী প্রতিষঅঠান হিসাবে গড়ে তোলে। ভারতের গণপরিষদের গঠনের দিকে দৃষ্টি দিলেই এটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গণপরিষদে এমন সকল সদস্যদের নিযুক্ত করেছিল যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল ব্রিটিশ সরকারের সহযোগী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্র বিরোধী। যেমন ভারতের দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের প্রতিনিধি এবং জমিদার শ্রেণীর বক্তিগণ। তাছাড়া কংগ্রেস বিরোধী বিভিন্ন রক্ষণশীল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাও গণপরিষদে স্থান পায়। এর মাধ্যমে কংগ্রেস এবং প্রকার রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি প্রবর্তন করলেও, ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনা করার ক্ষেত্রে গণপরিষদ কোনো র‍্যাডিক্যাল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। গণপরিষদ ভারতের বুর্জোয়া এবং সামন্ত্রতান্ত্রিক স্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকী দেশীয় রাজন্যবর্গকে স্থান দিয়ে কংগ্রেস প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকেই উৎসাহ দেয়। অন্যদিকে ঔপনিবেশীক আমলাতন্ত্রকেও কংগ্রেস সরকার ব্যবহার করে। কবিরাজের বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনকে কংগ্রেস সরকার যেভাবে দমন করে তা ছিল রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতারই বহিঃপ্রকাশ।

কবিরাজের মতে কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বাধীনতার পরে শ্রেণী সমন্বয়ের নীতি গ্রহণ করে। কংগ্রেস বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনে পরিণত হয়। এর ফলে যারা স্বাধীনতাকে বাঁধা দিয়েছিল তারা পুরস্কৃত হয়, অন্যদিকে কমিউনিস্টদের ুপর নেমে আসে দমন-পীড়ন। ভারতের গণতন্ত্র উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তদের মধ্যে রাজনৈতিক উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারলেও গ্রামাঞ্চলে সমকান গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারেনি। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি দরকষাকষিমূলক ব্যবস্থা—কোঠারীর এই দাবিকেও কবিরাজ গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে ব্যবসায়ী শ্রেণী, প্রাদেশিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং ভাষা নিয়ে আন্দোলনকারী যারা বিভিন্ন সময় সরকারের সামনে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, সরকার তাদের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতি আবলম্বন করলেও, শ্রমিক এবং কৃষি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনকে অনেক ক্ষেত্রে হিংসার সাহায্যে দমন করে। এক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং জনতা দল একই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সুদীপ্ত কবিরাজ মনে করেন আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অতীতেও দমন-পীড়নমূলক ছিল এবং ১৯৮০-এর দশক পর্যন্তও একই ছিল। এক্ষেত্রে অতীতের ঐতিহ্যকে আধুনিক চেহারা দেওয়া হয়েছে মাত্র।

সুদীপ্ত কবিরাজ মনে করেন ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে দুটি উপাদান সক্রিয় রয়েছে। একদিকে অতীতের পীড়নমূলক দিকটি রয়েছে; অন্যদিকে রয়েছে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি। ১৯৪৯-'৫০ সালের তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলন। ১৯৫১ সালে রেল শ্রমিকদের আন্দোলন, ১৯৬০-এর দশকের খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার সময় সমগ্র ভারত সরকারের পীড়নমূলক দিকটি প্রত্যক্ষ করেছে। এক্ষেত্রে বলা যায় ভারতীয় সংস্কৃতির পীড়নমূলক দিকটিই যেন আধুনিক চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছিল। আরেকটি স্ববিরোধ হল শহর এবং গ্রামের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অসম বিকাশ। শহরাঞ্চলে বুর্জোয়া মূল্যবোধ যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে, তা গ্রামে হয়নি।

শিল্প, কলকারখানার বিকাশ এবং শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভ শহরাঞ্চলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটালেও গ্রামাঞ্চলে সামন্ত্রতান্ত্রিক সংস্কৃতি ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিস্তারে বাঁধাদান করে। আজও বড় বড় রাজ্যে গ্রামীণ রাজনীতি জাত-পাত এবং ধর্মের ধর্মীয় হিসাবের দ্বারা নির্ধারিত হয়। একদিকে ধ্রুপদী সংস্কৃতিজাত কর্তৃত্ববাদ অন্যদিকে আধুনিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই ভারতে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে, তাকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকও বলা যায় না, আবার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ববাদীও বলা চলে না।

৩.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

1. Do you consider Asish Nanday's views of state as anti-modern? Argue your cases.
2. Discuss Asish Nandy's cultural approach to the state.
3. Discuss after Nandy the difference between 'state-oriented approach to culture' and 'culture oriented approach to the state'.
4. Do you consider Indian political culture as conducive to democracy? Argue your cases on the basis of Sudipta Kaviraj's analysis.
5. Discuss after Sudipta Kaviraj the relation of between Indian political culture and democracy.
6. Do you consider Indian traditional culture as anti-democratic? Argue your case.

৩.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Kaviraj, Sudipta. (1984). On the Crisis of Political Institutions in India. *Contributions to Indian sociology, 18* (2).

ii. Kaviraj, Sudipta. (2010). *The Imaginary Institution of India: Politics and Ideas.* New York : Columbia University Press.

iii. Nandy, Ashis. (1984). Culture, State, and the Rediscovery of Indian Politics. *Economic and Political Weekly , 19* (49), 2078-2083.

iv. Nandy, Ashis. (1989). The Political Culture of the Indian State. *Daedalus , 118* (4), 1-26.

v. Nandy, Ashis. (1995). An Anti-Secular Manifesto. *India International Centre Quarterly , 22* (1), 35-64.

পাঠক্রম : ১.৫

Unit-4

ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বহুসাংস্কৃতিবাদ: রজনী কোঠারী (Multiculturalism in Indian Context with special reference to Rajni Kothari)

গঠন :

৪.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ ভারতে বহু সংস্কৃতিবাদ

৪.৪ ভারতের উজ্জ্বল বহুসংস্কৃতিবাদের বিকাশের প্রতিবন্ধকতা ও তার প্রতিকার

৪.৫ উপসংহার

৪.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৪.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে—

ক) ভারতে বহুসংস্কৃতিবাদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য,

খ) ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বহুসংস্কৃতিবাদের বিকাশের প্রতিবন্ধকতা ও তার প্রতিকার

৪.২ ভূমিকা

বহু সাংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism) তত্ত্ব প্রয়োগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ভারত। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য হল ভারতের সৌন্দর্য; স্মরণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম, জাতপাত, বংশ ভাষার প্রভাব ভারতীয় জনজীবনে পরিলক্ষিত হয়ে এসেছে। স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানে লিঙ্গ, জাত, শ্রেণী, সম্প্রদায়, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান অধিকার, সুযোগ সুবিধা আইনগত দিক থেকে দেওয়া হয়েছে এবং কর্তব্য পালন করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, এই বহু সাংস্কৃতিবাদ ভারতে কিভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। তার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা এবং তা থেকে উত্তরণের আলোচনার আগে সংক্ষেপে বহু সংস্কৃতিবাদ ধারণাটির আলোচনা প্রয়োজন।

বহু সাংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism) ধারণাটির অর্থ হল বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত মতবাদ। বহু সংস্কৃতিবাদে সমপরিবেশে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতিকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়। এই বহু সংস্কৃতিবাদ সমাজে তখনই গড়ে

ওঠে যখন দেশের এবং বহিরাগত জনগণ একটি রাষ্ট্রে বা সমাজে বসবাস করে এবং সমবেত হয় এবং নিজ নিজ সংস্কৃতি পরস্পরের সঙ্গে লেনদেনের বা আদান প্রদান মাধ্যমে সংহতিসূচকভাবে বিকশিত হয়। বহু সাংস্কৃতিবাদ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে অজ্ঞতাজনিত যে বিভাজন তাকে প্রতিহত করা যায় এবং এই মতবাদে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহাবস্থানকে স্বীকার করা হয়। বিশিশ্ট মার্কিন লেখক এবং পৌর অধিকারের (Civil right) সমর্থক জেমস বলডুইন (James Baldwin) বলেছেন প্রতিটি বিষয় যখন আমরা মুখোমুখি হই প্রয়োজনে তার পরিবর্তন করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা যতক্ষণ কোনও জিনিসের মুখোমুখি না হই ততক্ষণ 'কিছুকেই পরিবর্তন করা যায় না।' আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি অজ্ঞতা মানবতাকে মুখোমুখি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে। পার্থক্যের মুখোমুখি হলে আমরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কল্যাণময় পৃথিবীর জন্য একসঙ্গে কাজ করতে পারি। তাই বহু সাংস্কৃতিবাদ গুরুত্বপূর্ণ কারণ-এর দ্বারা আমরা অজ্ঞতাজনিত বিভাজনকে দূর করতে পারি।

এককথায় বহু সাংস্কৃতিবাদ সহনশীলতা এবং গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজে সহায়তা করে, পার্থক্যগুলিকে দূরে সরিয়ে মানবজাত তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে নিজ নিজ পরিবারকে সহায়তা করে এবং এর ফলে একটি শান্তিপূর্ণ এবং মৈত্রীবন্ধন জাত জগৎ গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

মার্কিন শিক্ষাবিদ হাওয়ার্ড শোরর (Howard Shorr) এর মতে মানবজাতির উচিত বহু সংস্কৃতিবাদকে বিশ্বে শিক্ষার ভিত হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চারপাশে যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটে সেগুলির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে আমাদের নিজেদের জগৎকে অতিক্রম করে বিশ্বের বৃহত্তম মানবজাতি গড়ে তোলা। কানাডার রাজনৈতিক দার্শনিক উইল কিমলিকা (Will Kymlica) মন্তব্য করেছেন যে জাতিগত পরিচয় (ethnic identity) হল সংস্কৃতির আত্মপরিচয়ের (self identification) প্রধান উৎস এবং গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক সমীকরণের প্রধান কাঠামো।

বহু সাংস্কৃতিক মতবাদ সেই ধারণার দ্বারা গঠিত হয় যেখানে বলা হয় বাইরে থেকে আসা মানুষেরা তাদের নিজেদের ভাষায় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমহূকে মেনে চলবে। একই সঙ্গে এই মতবাদে এটাও বলা হয় যে সরকার কাঠামোগত অসুবিধাগুলি অপসারণ করবে এবং সাম্য ও অন্তর্ভুক্তির নীতিকে স্বীকার করবে।

সংক্ষেপে বলা যায় এই বহু সাংস্কৃতিবাদের নীতিতে বিভিন্ন জাত গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাজের অখন্ডতা স্বীকৃতি পাবে।

উপরোক্ত বহু সাংস্কৃতিবাদের ইতিবাচক দিকগুলির উল্লেখের পর আমরা এর কতকগুলি সমালোচনাও লক্ষ্য করি—(i) কেউ কেউ মনে করেন যে বহু সাংস্কৃতিবাদ আমাদের সামাজিক একত্বকে (homogenity) ব্যাহত করে। এছাড়া (ii) একটি ব্যাপক ভীতি দেখা যায় যে বাইরে থেকে আসা লোকেদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য যে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় তার ফলে বহু সাংস্কৃতিবাদের মধ্যে বিভাজন দেখা দিতে পারে। (iii) এছাড়া এই সমস্ত বাইরে থেকে আসা লোকেদের নিজ নিজ এলাকা (ghetto)-য় অবস্থানের ফলে দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন এলাকা গড়ে উঠার এবং পারস্পরিক বিরোধ ও অশান্তি দেখা দিতে পারে। (iv) আবার বামপন্থীরা সমালোচনা করে বলেন যে মূলধন জমায়েত করার মাধ্যমে যে রাজনৈতিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে সেখানে শোষক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়; এই পরিস্থিতিতে বহুত্ববাদী সংস্কৃতি সামাজিক সংহতি বজায় রাখার উপর চাপ দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাহত হবে। এই প্রসঙ্গে আবার কেউ কেউ বহু সাংস্কৃতিবাদতত্ত্বকে বিশ্ব পুঁজিবাদের একটি প্রতীক বলে গণ্য করেন। ঔপনিবেশ সৃষ্টিকারী শক্তি ঔপনিবেশ সংস্কৃতিকে নিজের অধীনে আনতে সচেষ্ট হয় এবং ঔপনিবেশের সংস্কৃতিকে নেটিভ সংস্কৃতি বলে গণ্য করে। (v) আবার কিছু কিছু উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতেও বলা হয়েছে যে কোনও কোনও রাষ্ট্রে বাইরে থেকে আসা লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে মদত দেয়। নির্বাচিত সরকারকে

উৎখাত করতে সক্রিয় হয়। উপরোক্ত সমালোচনার বিষয় বাস্তবে কোথাও কোথাও ঘটলেও তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে বাইরে থেকে কোনও রাষ্ট্রে আসা মানুষেরাও সেই রাষ্ট্রের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়।

কিমলিকা (Kymlica) কানাডার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে বাইরে থেকে আসা মানুষেরা অধিকতর সহজেই কানাডার সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। তারা অধিকতরভাবে কানাডার নাগরিকতা গ্রহণ করে, কানাডার প্রচলিত ভাষা শিখতে প্রয়াসী হয়, পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং কানাডার সংস্কৃতির এবং মানুষের মধ্যে বোঝাপড়াও সংহতি গড়ে ওঠে এবং বহু সাংস্কৃতিবাদের সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশ যেমন নিউজিল্যান্ড, ব্রিটেন বা সুইডেন, অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে বাইরে থেকে আসা লোকেরা (inmigrant) অধিকতর সহজে ওইসব দেশের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সামিল হয়। অবশ্য অন্যান্য দেশে এই সংস্কৃতির সমঝোতা সহজ হয় নি বা সময় সাপেক্ষ। তাই এমন কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ নেই যে বহু সাংস্কৃতিবাদ বাস্তবায়িত হতে পারে না। সাধারণভাবে বরং বলা যায় বহিরাগতরা এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে বহু সাংস্কৃতিবাদ সফলতার নজির গড়ে তুলেছে। আবার মানবজাতি তাদের সম্পর্ক শুধু নিজ জাতির সংস্কৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না; অধ্যাপক কে. ভি. ডোমিনিক (Prof. K. V. Dominic)-এর মতে এটাও প্রয়োজন যে মানুষ তার সাংস্কৃতিক চেতনায় সমাজের অন্যান্য প্রাণী ও গাছপালার সঙ্গেও সাংস্কৃতিক সমঝোতা বজায় রেখেছে।

অনুরূপভাবে ভিকু পারেখ (Bhiku Parekh) মন্তব্য করেছেন যে, বহু সাংস্কৃতিবাদে জাতগত সংখ্যালঘুদের বিশেষ অধিকারগুলির চাহিদা পূরণ বস্তুত বহু সাংস্কৃতিবাদেরই সহায়ক যাতে বিভিন্ন জাতি সংরক্ষিত অধিকারগুলি যথাযথভাবে ভোগের মাধ্যমে মুক্ত ও সমভাবে অধিকতর ক্ষমতাবান জাত পাতের সঙ্গে আলোচনা ও কথাবার্তা চালাতে পারবে। বহু সাংস্কৃতিবাদে তাৎপর্য, প্রকৃতি উল্লেখের পর আমরা ভারতে বহু সাংস্কৃতিবাদের প্রকাশটি বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করব।

৪.৩ ভারতে বহু সংস্কৃতিবাদ

বহু সাংস্কৃতিবাদ ভারতের সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্ম, ভাষা, জাত পাত গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, শ্রেণী প্রভৃতির ক্ষেত্রে বহু বৈচিত্র বর্তমান। এইসব বৈচিত্রগুলির পারস্পরিক মেলবন্ধন বহু সাংস্কৃতিবাদকে বিকশিত করেছে প্রথমে আমরা ভারতে বহু সাংস্কৃতিবাদের পক্ষে উপকরণগুলি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করতে পারি—

ধর্ম : ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি 'ধৃ' ধাতু থেকে এবং যার অর্থ হল ধারণ করা, এই অর্থে যা মানুষকে ধারণ করে তাই হল ধর্ম। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ভারতে বিভিন্ন ধর্মের যে অবস্থান তাতে হিন্দু ধর্ম- ৭৯.৮%, ইসলাম ধর্ম- ১৪.২%, খ্রিস্টান ধর্ম- ২.৩%, শিখ ধর্ম- ১.৭%, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী- ০.৭%। এছাড়া জোরোয়াখ্রিস্টান বাদী, সানমাহীবাদী এবং জডাইবাদী ধর্মাবলম্বী কয়েক হাজার করে রয়েছে।

ভারতের সংবধিানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম নেই। বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ধর্ম হল ব্যক্তিগত বিষয়। এদেশে সকল ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে যে যার ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারে। আবার ভারতের কোনও নাগরিক নাস্তিকও হতে পারে অর্থাৎ কোনও ধর্মমত গ্রহণ নাও করতে পারে।

তবে যদি ধর্মকে কেন্দ্র করে কোনও শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় তাহলে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনে সক্রিয় হবে। আবার ধর্মান্তরিত করণের ব্যবস্থাও স্বীকৃত। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে

আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের চল পরিলক্ষিত হয়।

ভাষা : ভারত হল বহু ভাষাভাষী দেশ। সরকারি ভাষা হিসেবে দেবনগরী হরফে হিন্দীকে এবং তৎসহ সহযোগী সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে সংবিধানে অষ্টম তফশীলে ২২টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—যথা অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দী, কানাড়া, কাশ্মীরি, কনকনি, মালয়ালাম, মনীপুরী, মারাঠী, নেপালী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, সিন্ধি, তামিল, তেলেগু, উর্দু, বোড়ো, সাঁওতালী, মৈথিলী, ডোগরী।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে হিন্দীর সঙ্গে ইংরাজিকে স্বীকার করা হয়েছে। আদালতের ভাষা হিসেবে ইংরাজি প্রচলিত। দেশে মোট ২২৭টি মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে আদিবাসী ভাষার বর্ণলিপিও সৃষ্টি করা হয়েছে।

পরিবার ব্যবস্থা : সনাতন ভারতবর্ষে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রথমে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে ও বর্তমানে তা মূলত একক পরিবার (nuclear family) ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এই যৌথ পরিবার ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ যা ভারতীয় সংস্কৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে। সুবিধাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(ক) একক ব্যক্তির পক্ষে অনেক সময় নূন্যতম প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না। উদ্বৃত্ত সম্পদ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সমষ্টিগত উদ্যোগ আয়জনের মধ্যেই সম্ভব এবং এই সুবিধা যৌথ পরিবার ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়।

(খ) যৌথ পরিবার ব্যবস্থার আর একটি বড়ো সুবিধা হল ব্যয় সংকোচ। এই ধরনের পরিবার ব্যবস্থায় এককালীন বেশি পরিমাণে পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বাজার থেকে ক্রয় করার ফলে পাইকারি মূল্য স্তরের সস্তা দামের সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হয়। এর ফলে অপেক্ষাকৃত কম খরচে পরিবারের সকলের ভরণপোষণ সম্ভব হয় এবং ব্যহবাহুল্যকে বর্জন করা যায়।

(গ) যৌথ পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ সামগ্রীর ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব হয়। এই ধরনের পারিবারিক সংগঠনে সকলে স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে আয় করে এবং প্রত্যেকে প্রয়োজন অনুসারে ভোগ করে। পরিবারের সকল সদস্যের রোজগার পরিবারের সাধারণ তহবিলে জমা পড়ে।

(ঘ) যৌথ পরিবার সামাজিক গুণাবলী ও ব্যক্তির সুকুমার বৃত্তিসমূহের যথাযথ বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, স্বার্থত্যাগ, উদার হৃদয়ব্রত্তা প্রভৃতি গুণাবলী যৌথ পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তি অর্জন করার সুযোগ পায়। বয়োজ্যেষ্ঠদের তদারকিতে শিশু ও কিশোর বয়সের সন্তান সন্ততিরা ভালোভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

(ঙ) যৌথ পরিবারে শ্রম বিভাগের সুবিধা পাওয়া যায়। পরিবারের প্রত্যেকের জন্য সাধ্য ও সামর্থ অনুসারে কাজের দায়িত্ব বণ্টিত থাকে। পরিবারের মহিলারা অন্দর মহলের কাজ কর্ম নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয় এবং অবকাশ যাপনের সুযোগ পায়। আবার প্রয়োজনে কৃষিকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা কোনও না কোনওভাবে অংশ গ্রহণের ফলে বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হয় না।

(চ) সামজিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের ভূমিকা অনন্য। দুর্যোগ দুঃসময়ে যৌথ পরিবারের কোনও সদস্য অসহায় হয়ে পড়ে না, বার্ধক্য, অসুস্থ ও অসমর্থ অবস্থায় পরিবার থেকেই প্রয়োজনীয় পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়।

(ছ) যৌথ পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া সহজ ও সাবলীল হয়।

যৌথ পরিবারের উপরোক্ত সুবিধার পাশাপাশি কিছু কিছু অসুবিধাও তুলে ধরা হয়েছে, যেমন—

(ক) যৌথ পরিবার ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ ও স্বতস্ফূর্ত বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(খ) যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় অলস ও অকর্মন্যরা প্রশ্রয় পায়ে।

(গ) যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় বিশেষত মহিলা সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক কলহ বিবাদের আধিক্য দেখা যায়।

(ঘ) যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় অন্যতম ত্রুটি হিসেবে মামলা মোকদ্দমার আধিক্যের কথা বল হয়। যৌথ সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা ক্ষেত্রে মত পার্থক্য ও বিরোধ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় শালিসীর মাধ্যমে এই বিরোধের মীমাংসা সম্ভব হয় না। তখন আইন আদালতের সাহায্য নিতে হয়।

বর্তমানে পারিবারিক ব্যবস্থায় একক পরিবারের প্রবণত দেখা গেলেও, স্বাবলম্বী পুত্র কন্যাদের তাদের পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন ও যোগাযোগের বিষয়টি রূপায়ণের উপর সামাজিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। পারিবারিক ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি থাকলেও এর শুভ দিকগুলি ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। যদিও একক পরিবার ব্যবস্থার (nuclear family) সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি পাশ্চাত্যের একক পরিবারের আদর্শকে তা অনুসরণ করছে না। ভারতে একক পরিবারের সদস্য মূলত যৌথ পরিবারের সুমহান আদর্শগুলিকেও অনুসরণ করে এবং তার ব্যতিক্রম ঘটলে সমাজে তা সমালোচিত হয় এবং আইনগত ব্যবস্থাও নেওয়া যায়।

আত্মীয়তা সম্পর্ক (Kinship) **:** অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S. C. Dube) তাঁর 'Indian Society' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন রক্তের সম্পর্ক বা বৈবাহিক সূত্রে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্ট হয় তাকেই বলে আত্মীয়তার সম্পর্ক। সাবেকি সমাজ কাঠামোর মতো আধুনিককালের সমাজ কাঠামো সম্পর্কেও একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই সম্পর্ক হল মূল ভিত্তি যার উপরে নির্ভর করে সামাজিক মিত্রাষ্ক্রিয়া (Interaction) সম্পাদিত হয়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক পিতৃগোত্রজ বা পিতৃপুরুষের সঙ্গে এবং মাতৃগোত্রজ বা মাতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে থাকে এবং এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অত্যন্ত গভীর।

এই আত্মীয় সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক হতে পারে, আবার বৈবাহিক সম্পর্ক ভিত্তিক হতে পারে। আগেকার দিনে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জাতিভেদ ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করা হত। অসবর্ণ বিবাহকে সমাজে স্বীকার বা সমর্থন করা সাধারণত হত না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অসবর্ণ বিবাহের পথে সমাজ আর তেমন বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করে না। বর্তমানকালে অসবর্ণ বিবাহের ঘটনা ক্রমবর্ধমান এর ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক ভিত্তিক আত্মীয় সম্পর্কের ধারার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আবার ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তারের ফলে আধুনিককালে জীবিকা ও মর্যাদার জন্য সমাজে প্রবল প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। এই রকম অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি ও তার পরিবার আত্মীয় স্বজনের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে। নির্ভরযোগ্য ও আন্তারিক সহযোগিতার জন্য নিকট আত্মীয় পরিজনের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে। নির্ভরযোগ্য ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য নিকট আত্মীয়ের উপরই ভরসা করা যায়। এই কারণে এখন ব্যক্তিবর্গ সমাজ আত্মীয়তার বন্ধনকে যেমন দৃঢ় করতে চায়, তেমনি আত্মীয়তার পরিধিকে প্রসারিত করতে চায়। এর ফলে আত্মীয়তার সাবেকি কাঠামোর পরিবর্তন দেখা যায় যা ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

জাতি ব্যবস্থা (Caste System) : জাতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Caste'। ইংরেজ 'Caste' শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ 'কাস্টা' (Casta) থেকে। 'কাস্টা' শব্দটির অর্থ হল জাতি, কুল প্রভৃতি। জাতি হল জন্মভিত্তিক এবং বুৎপত্তিগত অর্থে জাতির ভিত্তি হল 'জন্ম'। 'জাতি' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে 'জন' ধাতু থেকে। 'জন' বলতে জন্ম বোঝায়। সুতরাং জাতি হল জন্মভিত্তিক। সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করলে জাতি হল ব্যক্তিগতভাবে বিশেষীকৃত একটি গোষ্ঠী। তাছাড়া জাতির

একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হল অন্তর্বিবাহ। বস্তুত ডি. এন. মজুমদার এবং টি. এন. মদনের মতে জাতি হল একটি বদ্ধ গোষ্ঠী এবং আন্তর্বৈবাহিক ও বংশানুক্রমিক।

জাতি প্রথার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল 'সমপাঙক্তেয়তা' (Commenisality)। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বিধি ব্যবস্থা বা নিষেধাজ্ঞা (Taboo) প্রচলিত থাকে। সাধারণত খাদ্যাখাদ্য এবং জলচল ও জল সচল প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাবেককালে এই সমস্ত বিধি ব্যবস্থা বা নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত দেখা যায়। এগুলিকেই বলে সমপাঙক্তেয়তা। প্রতিটি জাতিই মনে করে যে তার নিজস্ব এই সমস্ত বিধি নিষেধ মেনে চলা অপরিহার্য। অন্যথায় জাতির শুচিতা বা শুদ্ধতা সংরক্ষণ সম্ভব হবে না।

তবে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই জাতপাত বদ্ধ নয়। সমাজবিজ্ঞানী এম. এন. শ্রীনিবাস স্বীকার করেন না যে জাতির ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার পথ একেবারে রুদ্ধ। তাঁর অভিসত অনুসারে 'সংস্কৃতিকরণ' (Sanakritisation) প্রক্রিয়ার মাধ্যম কোনও নিচু জাতি অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতিতে উন্নীত হতে পারে। অপেক্ষাকৃত নিচু জাতি উন্নততর জাতির বৃত্তি, আচার বিচার প্রভৃতি অনুকরণের মাধ্যমে জাতি বিন্যাসের ক্ষেত্রে উন্নততর স্তরে উন্নীত হতে উদ্যোগী হয়। এই উদ্যোগকে শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতিকরণ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রসঙ্গত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাষ্য অনুসারে যে চারটি বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রর কথা বলা হয়েছে তা গুণ ও কর্মের বিভাজনে সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি হল খজন-খাজন ও অধ্যায়ন-অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয়রা হল শাসক ও যোদ্ধা; তাদের কাজ হল রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন। বৈশ্যদের বৃত্তি হল ব্যবসা বাণিজ, কৃষিকর্ম ও গোপালন। শাস্ত্রানুযায়ী শূদ্রদের বৃত্তি হল উপরিউক্ত তিনবর্ণের সেবা করা। শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রধানত ভৃত, কায়িক শ্রমজীবি ও কৃষকেরা। আবার শূদ্র বলতে কামার কুমোর, তাঁতি এবং অন্যান্য হস্তশিল্প ও কারিগরি পেশায় নিযুক্ত জাতি গোষ্ঠীকে ও বোঝায়।

শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যানুযায়ী চতুবর্ণ ব্যবস্থায় উচ্চ নিচ ভেদাভেদ ছিল না গুণ ও কর্মের বিভাগের ভিত্তিতে সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এই চতুবর্ণবিশিষ্ট সমাজ আবদ্ধ ছিল না। টম বটোমোর (Tom Bottomore)-এর অভিমত অনুযায়ী এক বর্ণ থেকে অপর বর্ণে আরোহণ সবরোহণের বিষয়টি ব্যক্তির সামনে ছিল, অর্থাৎ চতুবর্ণ পুরোপুরি বদ্ধ গোষ্ঠী ছিল না। বৈদিক সমাজে আন্তবর্ণ বা অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃত ছিল। স্ববৃত্তি পালনে অযোগ্য ব্যক্তি বর্ণচ্যুত হত। ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মণ সন্তান সামাজিকভাবে পতিত হত। তেমনি আবার নিম্নবর্ণের ব্যক্তি উন্নত কর্মের মাধ্যমে যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে উচ্চতর বর্ণে উন্নীত হতে পারত। দাসীপুত্রের সামনে স্বগুণের সাহায্যে দ্বিজত্ব লাভের সুযোগ ছিল। সুতরাং বর্ণ বিভক্ত সমাজ বদ্ধ সমাজ নয়।

স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষের সংবিধানে তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংবিধানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারি চাকুরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণী (OBC)-র জন্য সরকারি চাকুরি এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেতে ২৭% আসন সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই OBC শ্রেণীদের মধ্যে যারা সামাজিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাদপদ তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরিশোধে ভারতে বহু সাংস্কৃতিবাদের আলোচনায় অভিবাসী (diaspora) অর্থাৎ যে সমস্ত ভারতীয় বিদেশে অবস্থান করে তাদের ওই অবস্থানকারী দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধনের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। এন. জয়ারাম (N. Jayaram) ভারতীয় অভিবাসীদের সাংস্কৃতিক ভূমিকাটিকে বিশ্বায়ন এবং সাইবারস্পেস এর দিক থেকে আলোচনা করেছেন। এন. জয়রাম এই ভারতীয় অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক আচরণের বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন বিশ্বায়নের প্রভাবে ওই ভারতীয় অধিবাসীরা নিজেদের দেশের সঙ্গে সম্পর্ককে হ্রাস করে, আর সাইবারস্পেস ওই অধিবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের এক 'কল্পিত

সভ্যতার' (imagined Civilisation) সঙ্গে সংযুক্ত করতে সুপারিশ করে যেখানে তারা পূর্বপুরুষের বাসস্থানের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে প্রয়াসী হয়।

অপরপক্ষে কে. এল. শর্মা (K. L. Sharma) ভারত থেকে তামিলদের শ্রীলঙ্কাতে মাইগ্রেশন (Migration) বা শ্রীলঙ্কাতে বসবাসের পূর্ব সিংহলীদের সঙ্গে যে বিরোধ ও সংঘর্ষ ঘটে তাকে ভারত ও শ্রীলঙ্কার সংস্কৃতির বিরোধ হিসেবে না দেখে ভারতীয় ও সিংহলীদের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণে বিরোধ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কোনও ভারতীয় কাজের জন্য অন্যদেশে গেলে সেই অভিবাসী ভারতীয়রা আজও ভারতের সঙ্গে তাদের পূর্ব সংস্কৃতির অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে যেমন সম্পর্ককে স্মরণ করেন। তেমনি নতুন দেশে বসবাস করে সেই দেশের সংস্কৃতির সঙ্গেও সমঝোতা করে দেন।

অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষ ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির শুভদিকটি বিবিধের মাঝে মিলন মহান এবং বিশ্বমানবিকতার উজ্জ্বল দিকটিও উল্লেখ্য।

৪.৪ ভারতের উজ্জ্বল বহু সাংস্কৃতিবাদের বিকাশের প্রতিবন্ধকতা ও তার প্রতিকার

ভারতের বহু সাংস্কৃতিবাদের বিশ্বজনীন মানবিকতার আবেদন অনস্বীকার্য; কিন্তু ভারতের এই উজ্জ্বল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ এবং বর্হিদেশীয় অন্যায় ও অনৈতিক কার্যকলাপগুলিও তুলে ধরা উচিত যাতে অবাঞ্ছিত বিষয়গুলি অপসারিত বা দূর করা যায় এবং ভারতের মানবিক বহু সাংস্কৃতিবাদ দেশে এবং বিশ্বের সর্বত্র শান্তি, সংহতি ও উন্নতির পরিমন্ডল গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

(১) প্রথমে বহু সাংস্কৃতিবাদের প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ্য অশুভ সাম্প্রদায়িকতা : 'সম্প্রদায়' শব্দটি থেকে 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটি এসেছে। শব্দগতভাবে 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটি অবাঞ্ছিত নয়। কিন্তু বাস্তবে 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটি কোনও সম্প্রদায়ের অন্যায় কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিপান চন্দ্র তার 'Communalisam in Modern India' শীর্ষক গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন বিভিন্ন সাম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক। তবে ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি মাত্রেই সাম্প্রদায়িক এমন কথা কখনই বলা যায় না। কারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে একজন ব্যক্তি তার নিজ ধর্ম আইন সঙ্গতভাবেই গ্রহণ ও অনুসরণ করতে পারেন।

কিন্তু যে সমস্ত রাজনীতিক ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে সংযুক্ত করে রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তাঁদের সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচনে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে সক্রিয় থাকে। সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন যে অল্পবিস্তর সমস্ত রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে জয়লাভ ও সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও দলগুলির সঙ্গে অশুভ আঁতাত করতে দ্বিধা করে নি। আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবাঞ্ছিত উদাহরণ স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে যেমন বিভিন্ন সময়ে ঘটে তেমনি ১৯৮৪-র ৩১শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিজরক্ষী কর্তৃক মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের পর দিল্লিতে শিখ সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ, হত্যা, ১৯৮৫তে স্বর্ণমন্দিরে জঙ্গিদের অবস্থানকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীর প্রবেশ ও ধ্বংসলীলা ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস সাধনের পর সাম্প্রদায়িক হিংসা ও দাঙ্গা হাঙ্গামা, গোধরায় ট্রেনে দুষ্কৃতিদের দ্বারা অগ্নিকান্ডের ফলে গুজরাটে হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ ঘটে এবং সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যু ও অত্যাচারের শিকার হতে হয়।

শাহবানু মামলায় (১৯৮৫) সুপ্রীম কোর্টে রায় দিতে গিয়ে হিন্দু ও মুসলমান ডিভোর্সীদের ভরণপোষণের ব্যাপারে সমানাধিকারের নীতি গ্রহণ করে। সুপ্রীম কোর্টের এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তকে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অতিক্রম করার জন্য উদ্যোগী হন। তিনি শরিয়েতের নিয়মকানুনকে দেওয়ানি আইন হিসেবে কার্যকর করার জন্য সংসদীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যদিও

মুসলমান শ্রেণীর এক অগ্রগামী অংশ সুপ্রীম কোর্টের এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন তথাপি ইসলামের গোঁড়া অংশের রাজনৈতিক সমর্থন লাভের আশায় সুপ্রীমকোর্টের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় নি।

সম্প্রতি (২০১৯, ডিসেম্বর) বি.জে.পি. সরকারের নাগরিকতা সংক্রান্ত আইন নিয়ে সারা ভারতে প্রতিবাদ দেখা গিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসা ইসলাম ধর্মীয় ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে ভারতের নাগরিকতা অর্জন সংক্রান্ত আইন পার্লামেন্টে পাশ করা হয়েছে? বিরোধীদের শুধু এই তিনটি দেশের পরিবর্তে 'প্রতিবেশী দেশগুলি' (Neighbouring Countries) সংযোজন করার প্রস্তাব বি. জে. পি প্রধান এন. ডি.-এর মোদী সরকার গ্রহণ করে নি, আবার শুধু ইসলাম ধর্মকে বাদ দিয়ে অন্য ধর্মালম্বীদের ভারতের নাগরিকতা অর্জনের সুযোগ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির পরিপন্থী।

এইভাবে অবাঞ্ছিত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে ব্যাহত করেছে এবং যা মুক্ত বহু-সাংস্কৃতিবাদ নীতির বিরোধী। এই পরিস্থিতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে সকল ধর্মকে সমানভাবে দেখতে হবে এবং আইনসঙ্গত উপায়ে সকল ধর্মের বা নাগরিকদেরও নাগরিকতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা উচিত এবং তবেই যথার্থ সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব।

(২) ভাষাগত সংকীর্ণতা ও অশান্তি ও তার প্রতিবিধান : ভারতে জাতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দী ভাষাকে ও সহযোগী জাতীয় ভাষা হিসেবে ইংরাজিকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমে ইংরাজি ভাষাকে ১৫ বছরের জন্য জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও পার্লামেন্ট তা পরবর্তীকালে বাড়িতে পারবে এই কথা সংবিধানে উল্লেখিত হয়। বস্তুত হিন্দী ও ইংরেজি ভাষা জাতীয় ভাষা হিসেবে কার্যকর করা হয়।

কিন্তু হিন্দী ভাষার উগ্রসমর্থনকারীদের জোর করে হিন্দি চাপানোর চেষ্টার ফলে উত্তরপ্রদেশসহ ভারতের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে ভারতের দক্ষিণাংশে প্রবল হিন্দি বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে ওঠে; এমনকি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আত্মহননও ঘটে। বিভিন্ন ভাষা হল সংস্কৃতির বিকাশের অন্যতম সম্পদ, তাই প্রত্যেক ভারতীয়ের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ কাম্য। একই সঙ্গে নিম্ননার্সারি থেকেই মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরাজিকে আবশ্যিকভাবে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ যে রাজ্যে যা প্রধান মাতৃভাষা সেই ভাষা ও ইংরেজি প্রতি স্কুলে থাকবে এবং একই সঙ্গে অন্যভাষা ভাষীরা যাতে তাদের মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ পায়, তাই সেই ভাষাভাষীরা যে অঞ্চলে রয়েছে, সেই সব অঞ্চলের স্কুলগুলিতে সেই রাজ্যের মাতৃভাষা, ইংরাজি এবং ওই অঞ্চলের অধিকতর অন্যভাষাভাষীদের জন্য তাদের ভাষাকে স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থার থাকবে। সিলেবাস ও সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে যথাসম্ভব সমানভাবে গ্রহণ করা হবে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে প্রশ্নাবলী সেই রাজ্যের মাতৃভাষা ও ইংরেজিতে হবে। যেহেতু সব ছাত্রছাত্রীই নার্সারি থেকে ইংরেজি পড়ছে, তাই ওই রাজ্যের প্রধান ভাষা যাদের মাতৃভাষা নয়, তারা ইংরাজিতে প্রশ্ন পড়ে নিজ মাতৃভাষায় উত্তর লেখার সুযোগ পাবে এবং তাদের খাতা ওই ভাষার ও বিষয়ের শিক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত করতে হবে যাতে খাতা দেখার ব্যাপারে কোনও গাফিলতি না হয়। প্রয়োজনে ক্যুরিয়ারে খাতা পাঠিয়ে তারা যথাযথ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

মূলত ভাষা ও গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে রাজ্য গঠন ভারতে ঘটেছে, যেমন বোম্বাই-কে ভেঙ্গে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, বিহার থেকে ঝাড়খন্ড, মধ্য প্রদেশ থেকে ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ থেকে উত্তরাখন্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে তেলেঙ্গানা। কিন্তু একই সঙ্গে অযৌক্তিকভাবে রাজ্য গঠনও আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অকাম্য। পঃ বঙ্গে গোর্খাল্যান্ড গঠনের আন্দোলনকে পঃবঙ্গ সরকার ন্যায্যভাবে সমর্থন করে নি। কিন্তু ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের যুক্তিসঙ্গতভাবে রাজ্যের তত্ত্বাবধানে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্বশাসনের (autonomy) সুযোগও প্রদান করা হয়েছে এবং তা নিরপেক্ষভাবে করা উচিত। এক কথায় কোনও সম্প্রদায় তাদের ভাষা। সংস্কৃতির বিকাশ ও সুযোগ সুবিধা যথাযথভাবে পেতে পারে সেদিকেও রাজ্যকে ন্যায়সঙ্গতভাবে দায়িত্ব নিতে

হবে।

(৩) আর্থিক অসঙ্গতি ও তার দূরীকরণ : সুস্থ চিন্তা ও সংস্কৃতির বিকাশ তখনই যথার্থভাবে সম্ভব যখন মানুষের আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বহুসংস্কৃতি সম্পন্ন ভারতে যথার্থ বহুসংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ বাস্তবে ঘটেনি সেহেতু ভারতীয় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই আর্থিক স্থিতিশীলতা নেই।

স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজভাবে বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রকল্প ঘোষণা করলেও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা অধিকাংশ জনগণের নূন্যতম ভদ্রজীবন যাপন অর্জনে সক্ষম হয় নি। কোনও দেশের যথার্থ উন্নতি তখনই বলা যায় যখন দেশের আপামর জনসাধারণের নূন্যতম ভদ্রজীবন যাপন যথা খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, শিক্ষা স্বাস্থ্য, আর্থিক স্থিতাবস্থা এবং নিরাপত্তা অর্জিত হয়।

এই নূন্যতম ভদ্রজীবন অর্জনের জন্য সরকারের অবাঞ্ছিত ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যক। ক্ষমতাসীন সরকার, রাজনৈতিক, দল, সাংসদ, বিধায়ক, পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি/কর্পোরেশনের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন, পূজাকমিটির সংখ্যালঘু শ্রেণীদের যে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে অনেক সময় অপব্যয় হিসাবেই দেখা দিয়েছে। অবশ্যই কোনও সংগঠনের যথার্থ জনকল্যাণকর কাজ সরকার সাহায্য করবে, কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই তা অপব্যয়ের চেহারা নিয়েছে এবং সমালোচকদের কাছে মনে হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসার জন্যই বেশি ব্যস্ত। এছাড়া সাংসদ, বিধায়কগণ তাঁদের পদের জন্য যথাযথ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এলাকার উন্নয়নের জন্য অর্থ পান। কিন্তু সাংসদ, বিধায়কদের আজীবন, পারিশ্রমিক পেনশন প্রদান আইনত যথার্থ কিনা তা বিবেচ্য, এই পদগুলি সরকারি পদ নয়।

এছাড়া মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডি.এ. বা মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি কর্মী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রায়ই আন্দোলন ও দাবি জানায়, আবার কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ডি.এ.-র পার্থক্য নিয়ে সমালোচনা ও বিক্ষোভ ও দেখানো হয়। কিন্তু যারা বেকার, বেসরকারি কর্মচারি, যাদের কর্মসংস্থান অনিশ্চিত তাদের কথা ভাবা হয় না। উপরন্তু বিংশ শতকের শেষ দশক এবং একুশ শতকের প্রথম দুদশকে লক্ষ্য করা গিয়েছে কৃষকদের যে ঋণ সরকারি ব্যাংকগুলি থেকে দেওয়া হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে সরকার থেকে মকুব করে দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে হাজার হাজার কোটি টাকা সরকারের ক্ষতি হয়েছে। অনেক সময় নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলি ঘোষণা করে যে ক্ষমতায় এলে কৃষকদের ঋণ মকুব করা হবে। বাস্তবেও তা ঘটেছে।

কৃষকরা হলেন সমাজের অন্যতম সহায়ক কর্মী তাদের কাজের উপরই ভারতের মতো দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা ঘটে যেহেতু ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। উপরও বর্তমান যুগে কৃষিজীবীরাও একদিক থেকে শ্রমিকের স্থানও অর্জন করেছে। তাই কৃষি চাষের সঙ্গে যেমন যুক্ত তেমনি কৃষিজ শিল্প (agricultural industry) হিসেবেও গণ্য হয়ে থাকে। বর্তমানে চাষ করা এক ব্যয়সাধ্য বিষয়, যেখানে কৃষকের নিজের জীবনে স্থিতিশীলতা নেই, সেখানে সারাবছর হাল গুরুর ভরণপোষণ, সুস্থতা এবং চাষের সময় কৃষি শ্রমিকের খরচ, সার এবং অন্যান্য চাষের উপকরণ যোগানো রীতিমতো ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি বাধা তো আছেই।

তাই এই কৃষির সমস্যা উত্তরণে ব্যক্তি মালিকানাকে বজায় রেখে যদি সমবায় বা যৌথ চাষ ব্যবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণে চালু করা যায় তাতে চাষ করা অধিকতর সফল ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত হবে। সাবেকি চাষ ব্যবস্থার পরিবর্তে ট্রাক্টরের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ ব্যবস্থা, জৈব সার ব্যবহারে ফসল বাড়বে খন্ডিত জমি থাকার ফলে যে জমি নষ্ট হয় তা এড়ানো সম্ভব হবে। যাঁরা প্রান্তিক চাষী তাঁরাও কাজে যুক্ত হবে পারিশ্রমিক পাবেন। যৌথ চাষের ব্যয় জমির মালিকেরা তাদের মালিকানা

অনুযায়ী ব্যয় বহণ করবে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অধীনে এই যৌথ চাষ ব্যবস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণে হলে অসাধুতাকে ঠেকানো সম্ভব হবে। প্রয়োজনে নাগরিক সমাজকে এই দায়িত্বে যুক্ত করা যেতে পারে।

আর কৃষিকার্যে ঋণ ব্যক্তিগত কৃষকের পরিবর্তে সমবায় সংস্থার দায়িত্বে থাকবে, সাধ্যমতো কম সুদে ঋণ দেওয়া হবে। কিন্তু মূলধন ও ঋণ অবশ্যই শোধ করতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঋণশোধ সামগ্রিকভাবে স্থগিত রাখা যেতে পারে। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই তা মকুব করা যাবে না। 'লাঙল যার জমি তার' বর্গাদার ব্যবস্থার সুফল বাস্তবে ফলপ্রসূ হয় নি। একদা জমিদার শ্রেণীর এক অংশ যারা শুধু জমির উপর নির্ভর করত এর ফলে তারা আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। বর্গাদারভুক্ত জমির দাম বাজারে কম। উপরন্তু এতে বর্গাদার ও জমির মালিক যারা প্রত্যক্ষভাবে চাষে যুক্ত হতে পারে না তাদের মধ্যে অসন্তোষ গড়ে ওঠে। শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক বা কর্মচারিদের চাকুরির নিরাপত্তা বিষয়টি বামপন্থী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও যথাযথ গুরুত্ব দেয় নি। যেকোনও সময়েই বেসরকারি শিল্পে শ্রমিকরা ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন হয় বা কারখানা অনির্দিষ্ট কালের জন্য হঠাৎ বন্ধ করা হয়।

৪.৫ উপসংহার

এককথায় ভারতীয় বহু সংস্কৃতিকে সুস্থ ও ইতিবাচকভাবে বিকাশিত করার জন্য যথাযথভাবে ধর্ম ও ভাষার বিকাশ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি, উচ্চনীচ ভেদাভেদ দূরীকরণ, সমস্ত ব্যক্তিকে ভদ্র জীবন যাপনের সুযোগ দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিকে সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে দেশের উন্নতিতে সামিল হতে হবে। কেবলমাত্র আর্থিক দিক থেকে যারা দারিদ্র সীমার নিচে তাদের এবং যারা শারীরিক দিক থেকে অক্ষম তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণকে আবশ্যিক করতে হবে, হাতে কলমে কাজ শেখার ও কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ বাড়াতে হবে। তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ন্যায্য দামে কেনার ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবেই বহু সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ভারতের যথার্থ উন্নতি সম্ভব এবং জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে। সব ধর্ম সমান, যত মত তত পথ, শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে, সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে হবে। সুস্থ বিশ্ব সংস্কৃতির মধ্যেই সকল দেশের ও ভারতের সুমহান সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব।

৪.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) বহু সংস্কৃতিবাদের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন; এর উৎপত্তি ও যথার্থ বিকাশ বিশ্লেষণ করুন।

খ) ভারতে বহু সংস্কৃতিবাদ ধারণাটির বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

গ) ভারতে বহু সংস্কৃতিবাদের প্রতিবন্ধকতা ও তা দূরীকরণের পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

৪.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Bottomore, Tom. (1979). *Political Sociology.* London: Hutchinson.

ii. Chandra, Bipan. (1984). *Communalism in Modern India.* New Delhi: Har-Anand.

iii. Ghurye, G. (1957). *Caste and Class in India.* Bombay: Popular Book Depot.

iv. Gupta, Bela D. (1972). *Sociology in India.* Kolkata: Centre for Sociological Research.

v. Kothari, Rajni. (Ed.). (1970). *Caste in Indian Politics.* New Delhi: Orient Longman.

vi. Srinivas, M. N. (1972). *Social Change in Modern India.* New Delhi: Orient Longman.

পাঠক্রম : ১.৫

Unit-5

ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতা
(Secularism in Indian Context with special reference to Ashis Nandy and T.N. Madan)

গঠন :

৫.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৫.২ ভূমিকা

৫.৩ সেকুলারবাদ/ধর্মনিরপেক্ষতা : একটি পশ্চিমী ধারণা

৫.৪ ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতা : বিশেষ ব্যঞ্জনা

৫.৫ ভারতীয় সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র আদর্শ

৫.৬ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মনিরপেক্ষকরণ

৫.৭ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা : সাম্প্রতিক বিতর্ক

৫.৮ উপসংহার

৫.৯ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৫.১০ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

বর্তমান পাঠ উপকরণে প্রথমেই একটি ধারণা হিসেবে সেকুলারবাদ (Secularism) বা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র স্বরূপ উত্থাপনের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে একথা মনে রেখে আলোচনা শুরু করা ভালো যে, একটি ধারণা হিসেবে এটি পশ্চিমের উদ্ভাবন ভারতে তার ব্যঞ্জনা গ হলেও ভিন্নতর। সেদিক থেকে ইংরেজি 'সেকুলার' (Secular) শব্দের বাংলা অনুবাদে ধর্মনিরপেক্ষ কতটা যুক্তি সম্মত সে প্রশ্নও তোলা যেতে পারে। আপাতত বলি যে, পশ্চিমে যে বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে ধারণাটির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, ভারতে তার প্রেক্ষিতটি অনেকটাই অন্যরকম। তাই মূল ধারণাটির সঙ্গে ভারতের বিশেষ ব্যঞ্জনাটির পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকাটা বিশেষ জরুরি। সেকারণেই বর্তমান পাঠ উপকরণের দুটি পৃথক অংশে মূল পশ্চিমী ধারণা ও ভারতে তার বিষে ব্যঞ্জনা আলাদাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিশেষ তাৎপর্য্যের নিরিখেই সাংবিধানিক আদর্শ (Constitutional ideal) হিসেবে তার অন্তর্ভুক্তি অনুধাবন করা সম্ভব। যে কারমে আরেকটি পৃথক অংশ ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বিবৃত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে একটি ধারণা (concept) বা একটি আদর্শ (ideal) হিসেবে বিষয়টি আলোচিত হলেও একই সঙ্গে এটি নীতি (policy) হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও

তা রূপায়ণের প্রক্রিয়া (process)-টির আলোচনা সহরাচর উপেক্ষিত হয়ে থাকে। বর্তমান পাঠ উপকরণে তাই আদর্শ হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' (secularism) এবং নীতি (policy)-কে রূপায়ণ প্রক্রিয়া (process) হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষকরণ' (secularization)-এর মধ্যেকার পার্থক্যটি মনে করিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। একটা সময় পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্মীয় বন্ধুত্ববাদ (religions plurelism)-এর প্রেক্ষিতে 'সহনশীলতা' (tolerance)-এর ব্যাখ্যায় এক ধরনের সহমত বা সর্বসম্মতি (consensus) অন্তত তত্ত্বগতভাবে গড়ে উঠলেও কাল প্রবাহে তা নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক দানা বেঁধে ওটেঠ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা-র ধারণা বিভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বর্তমান পাঠ উপকরণে শিক্ষার্থীদের সে সব বিতর্কের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন করে বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমান পাঠ উপকরণটি অনুশীলনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা কমবেশি অবহিত হতে পারব।

- একটি ধারণা হিসেবে সেকুলারবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)-এর উদ্ভব বিকাশ এবং সেই সূত্রে পশ্চিমে উদ্ভুত ধারণার মূল নির্যাস;
- ভারতীয় প্রেক্ষিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ধারণার বৈশিষ্টতা;
- ভারতীয় সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র আদর্শ ও তার তাৎপর্য ;
- ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ-করণ (Secularization)-এর প্রক্রিয়াটি অনুধাবন;
- ভারতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র প্রশ্নে উদ্ভূত বিতর্কসমূহ;

৫.২ ভূমিকা :

সাধারণভাবে ইংরেজি সেকুলার (Secular) শব্দটি থেকেই বাংলায় অনুবাদে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে; একইভাবে ইংরেজি সেকুলারিজ্‌ম (Secularism)-কে বাংলায় 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু মূল ইংরেজি ধারণা হিসেবে 'সেকুলার-বাদ'-এর উদ্ভব ও বিকাশের প্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে যা বোঝাতে চাই, তার সবটা মেলে না। সেদিক থেকে ইংরাজি secular বা secularism-কে বাংলাতে ও বোধ করি 'সেকুলার' বা 'সেকুলার বাদ' বললে ভালো হয়। তবে অনুবাদে যে শব্দ-বন্ধই আমরা ব্যবহার করি না কেন, ইংরেজি 'সেকুলারিজ্‌ম' (Secularism) এর ধারণার সঙ্গে ভারতীয় প্রেক্ষিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র ধারণার পার্থক্যটি মনে রাখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। পশ্চিমে যেখানে 'নবজাগরণ'-এর প্রবাহে সেকুলারিজ্‌ম-এর ধারনার উদ্ভব ঘটেছে। সে কারণে যে কোনও ধরনের পার্থিব সম্পর্কেই সেখানে গুরুত্ব দিয়ে অপ্রাকৃত বা অপার্থিব কল্পনার বিষয়কে অস্বীকারের প্রবণতাটিই সেখানে স্পষ্ট হয়েছে। সহজ করে বলা যায় যে, সব ধরনের অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরব হওয়াই যেহেতু 'নবজাগরণ'-এর মূল প্রেরণা, সেক্ষেত্রে যুক্তিবাদী সমাজমনস্কতাই সেকুলারবাদে মূল মন্ত্র। বিষয়টি যদি 'বিশ্বাসের ক্ষয়, যুক্তির জয়' গোচের মনোভঙ্গির সাথে মেলানো যায়, তবে হয়তো পশ্চিমে সেকুলারবাদের জন্ম ও বিকাশের ইতিহাসটি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। কিন্তু ভারতীয় প্রেক্ষিতে সব রকমের ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করে নয়; বরং রাষ্ট্রকে সব ধর্মবিশ্বাস থেকে সমদূরত্ব (Equi-distance from all religions) বজায় রেখে সহনশীলতা (tolerance)-এর নীতিতে আস্থা স্থাপনের ব্যবস্থাকেই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলে সাধারণভাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। 'সব ধর্ম সব ভাব'-এর আদর্শটিই ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতা আদর্শ হিসেবে পরিগণিত।

ভারতীয় প্রেক্ষিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র আদর্শ (ideal)-এর উৎস অনুসন্ধানে নানা কথা স্বতঃই এসে ভিড় করে। তার

মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা। সম্প্রদায় থেকে সাম্প্রদায়িকতা—সাধারণভাবে একথা যেমন সত্য; তেমনই এদেশে সাম্প্রদায়িকতা বা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূল উৎসভূমি যে ধর্ম সেটাও অনস্বীকার্য। এখন প্রশ্ন হল এই যে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা-এ দু'টি কখনই সমর্থক নয়। তাই মুখ্য প্রাসঙ্গিকে বিষয় ঠিক কোনটি তা নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাও ধরণ নিয়ে ও তাই বিতর্ক যথেষ্ট। পশ্চিমী সেকুলারবাদের সূত্রে ধরে অনেকেই বলতে চান যে, ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যার অনুশীলনে ধর্মীয় পরিচিতির গুরুত্ব হ্রাস পায়। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা সেই অর্থে ধর্মীয় প্রভাবের ক্ষয় এবং যুক্তিবাদী সমাজমনস্কতার হয়। কিন্তু এরকম বিচারধারা অনুসরণে 'সাম্প্রদায়িকতা বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা' গোছের এক ধরনের দ্বিত্ব (dualism) উপস্থাপন করা গেলেও বিষয়টি বোধ করি এতটা সহজ নয়। সেক্ষেত্রে একধরনের 'অতিসরলীকরণ' (oversimplification) আমাদের বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। তাই বর্তমান পাঠ উপকরণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই হল এক ধরনের ধারণাগত স্বচ্ছতা (Conceptual clarity) আয়ত্ব করা পর মধ্য দিয়ে পশ্চিমের সেকুলারবাদের সঙ্গে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার পার্থক্যগুলি অনুধাবন করা সম্ভব হবে এবং ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিশেষ ব্যঞ্জনাগুলি চিহ্নিত করা যাবে।

ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার বিশিষ্টতাটি অনুধাবন করতে না পারলে ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র আদর্শটি ও আমাদের অধরা থেকে যাবে এবং কেবলমাত্র কতগুলি বাধা ধরা শব্দবন্দের মধ্যেই আমাদের ঘুরপাক খেতে হবে। তাই ধারণাগত স্বচ্ছতার পথ বেয়েই আমাদের সংবিধানে বর্ণিত আদর্শের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের মূল সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হয় নি; কিন্তু সংবিধানের মূল অংশেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি প্রতিফলিত হয়েছে। কেহ এই বৈপরীত্য—তার কারণ অনুসন্ধানে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে হয় প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের অভিজ্ঞতায় এবং বিশেষত সংবিধান সভার বিতর্কে। ১৯৭৬-এ সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ (secular) শব্দটির অন্তর্ভুক্তির কারণ ও আমাদের অনুসন্ধান করতে হয় সমকালীন রাজনীতির গভীরে। এসব কথা বলার অর্থ এটাই যে, ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের কাজটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গভীরে গিয়েই আমাদের অনুশীলন করতে হয়। নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা কিছু ধ্যান-ধারণার মধ্যে আটকে থাকাটা তাই সবসময়ে সমীচিন বলে বিবেচিত হয় না।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে বিশেষত সাম্প্রতিক সময়কালে ধর্মনিরপেক্ষতার ধরণধারণ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির জন্য একদিকে যেমন একটি আদর্শ (ideal) হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার (secularism)-এর স্বরূপ সন্ধান অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে তেমনই নীতি (policy) হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষকরণ (secularization)-এর প্রক্রিয়া (process)টি বিশ্লেষণ করা ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ বলে মনে হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার পথ বেয়ে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, ধর্মনিরপেক্ষতা-র আদর্শ—তার ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন—তার রূপায়ণে রাষ্ট্রের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ; তেমনই নাগরিক সমাজ (civil society)-ও এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিসর যেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষকরণ'-এর প্রক্রিয়াটি ক্রিয়াশীল হয়। বলা বাহুল্য যে এসব আলোচনার সূত্র ধরে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক—উভয় ক্ষেত্রেই নানা ধরনের বিতর্ক সামনে এসে পড়ে। ছদ্ম-সাম্প্রদায়িকতা (psendo-communalism) থেকে 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা' (psendo-secularism)-এর অভিযোগ ও পালটা অভিযোগ ও উত্থাপিত হয়ে থাকে।

সাম্প্রতিক কালে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কিত বাদ-বিসম্বাদ এখানেই থেমে থাকে নি। আধুনিকতা থেকে উত্তর আধুনিকতা সম্পর্কিত বৃহত্তর তাত্ত্বিক পরিসরে বিতর্ক সমূহ প্রতিস্থাপিত হয়েছে সেই প্রক্রিয়া ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায় অনেকগুলি মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী আশীষ নন্দী ও টি. এন. মদনের Anti-modernist (Anti-

secularist) অবস্থান, সহনশীলতা (toleration)-এর ধারণার নতুনতর ব্যাখ্যায় সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চ্যাটার্জির বক্তব্য; অচিন বানাইকের মার্কসবাদী মূল্যায়ন, অমর্ত্য সেনের ব্যাখ্যা সব মিলিয়ে সব কিছুকেই নতুন ভাবে ভেবে দেখার রসদ এখন আমাদের সামনে উপস্থাপিত।

৫.৩ সেকুলার-বাদ/ধর্মনিরপেক্ষতা : একটি পশ্চিমী ধারণা

আগেই বলা হয়েছে যে, একটি ধারণা হিসেবে 'সেকুলারিজম' (secularism)-এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে অষ্টাদশ শথকের ইউরোপের নবজাগৃতি বা দীপয়ণ (Enlightement)-এর বৃহত্তর প্রবাহেই তার জন্ম। অত্যন্ত সাধারণভাবে বলা চলে যে, ঐতিহাসিকভাবে 'সেকুলার' বলতে সেই সব বিষয়কেই বোঝানো হত; যেগুলি ধর্মে সঙ্গে কোনওভাবেই সম্পর্কিত নয়। মানুষ ও তার সমাজ সম্পর্কিত ভাবনায় 'পার্থিব' (mundene/temporal) বিষয়সমূহকেই প্রধান বিবেচ্য হিসেবে মনে করা হত। বস্তুত পক্ষে নবজাগরণের প্রবাহে ধর্মীয়/অপার্থিব নানা বিষয়ের সঙ্গে সংঘাতের প্রেক্ষিতে যৌক্তিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিতেই 'সেকুলার' শব্দটি ব্যবহারের প্রবণতা গড়ে ওঠে। সেদিক থেকে 'ধর্মবিশ্বাসের ক্ষয় এবং যুক্তি জয়' গোছের কথাবার্তাই 'সেকুলার' ভাবাদর্শের গোঁড়ার কথায় হিসেবে পরিগণিত হয়। বিভিন্ন অভিধান অনুসরণেও secular শব্দের অর্থ সন্ধানে এরকম ধারণাই লক্ষ্যণীয় হয়। সেখানেও প্রতিশব্দ হিসেবে wordly বা temporal ইত্যাদি শব্দগুলিই উঠে আসে; জোরটা পড়ে ধর্মের সাথে সম্পর্ক বিহীনতার কথায়। The shorter oxford english dictionary-তে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

Belonging to the world and its affairs as distinct for the church and riligion-A negative term with focus on non-eccleseastical, non-sacred and non-religious - secular is what is not conerned with or divorad to the service of religion - a sphere of wordly and unspiritual affairs.

1851 সালে secular শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ব্রিটিশ লেখক George Jacob Holyoake। তিনি ও এমন এক ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা (social order) বোঝাতে এটি ব্যবহার করেছেন, যেখানে ধর্মের সঙ্গে তা সম্পর্ক রহিত হয়। তিনি অবশ্য এক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে ধর্মবিরোধিতা বা ধর্মকে অস্বীকা করার কথা বলেন নি। তার মতে, It is an argument not-against religion, it is one independent of it. প্রসঙ্গত বলি যে, Barry kosmin তাঁর সেকুলারিজম সম্পর্ক আলোচনায় Hard secularism এবং Soft secularism-এর কথা বলেছেন। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, প্রথমটি হল এমন একটি ধারণা যা ধর্মবিশ্বাসকে জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাবেই অস্বীকার করে, কারণ তার যৌক্তিক নয় এবং অভিজ্ঞতালব্ধও নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার অভিমত এই যে, যেহেতু সত্য সর্বদাই আপেক্ষিক, তাই সংঘাতে না গিয়েও সন্দেহ পরায়ণতা ও সহনশীলতার (skepticism and tolerance) অবস্থান গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর।

সেকুলারিজম্-এর সংজ্ঞা নির্ণয়ের এমনতরো প্রয়াস থেকে বলা যেতে পারে যে, 'সেকুলার' বলতে সেই সব বিষয়সমূহকেই চিহ্নিত করা হয় যার সাথে ধর্মীয় বিশ্বাস-ব্যবস্থার কোনও সম্পর্ক নেই। Wilson Payan তাই লিখেছেন:

[It] denounees all form of supernaturalism and the agencies devoted to it, advocating non-religions or anti-religions principles as the basis of personal morality and social organisation.

প্রসঙ্গত: এসেই পড়ে সেকুলারিজম (secularism)-এর সঙ্গে আধুনিকতা (modernity)-র আন্তঃসম্পর্কের কথা। ঐতিহাসিকভাবে 'দীপায়ন'-এর পটভূমিতে এ'দুটি ধারণারই উদ্ভব। মানব-সম্পর্কের বিশ্লেষণে এক ধরনের যৌক্তিকতার প্রাধান্য

উভয় ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। তদানীন্তন সময়ের প্রধানত 'বিশ্বাস-ব্যবস্থা' (behif-system)-র প্রতিষ্ঠানে যৌক্তিকতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রক্রিয়াতেই দুটি ধারণা সামনে এসেছে। উদারনৈতিক ভাবাদর্শের জন্মও এই প্রক্রিয়ার পথে বেয়েই। তবে, এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিমে এভাবে সেকুলারবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটলেও সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে যে ঐক্যমত ছিল—এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। সাধারণভাবে ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা বলা হলেও ধর্ম-বিরোধিতার কথা যে তার একমাত্র উপজীব্য তাও না; বরং ধর্ম বিষয়ে ঔদাসীন্যই অধিকতর গ্রহণীয় বলে অনেকে মনে করেছেন। তাই একে anti-religions না বলে non-religions বলাই অধিকতর সঙ্গত হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেউ বা আবার বলেছেন, এখানে religions discourses ignored, rather than confronted এখানেই শেষ নয়। যাহা secular তাহাই modern কিনা—সে বিষয়টি ও আলোচনা এসেছে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে ধর্ম ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্কের কথাও—যেখানে এ-দুটির ক্ষেত্রকে পৃথকীকরণ করার কথা বলা হয়েছে। সেখান থেকেই public-private divide এর তত্ত্ব উদ্ভাবন করে privatization of religion-এর তত্ত্বকে secularism-এর ভাবনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই আলোচনা থেকে একটি ধারণা হিসেবে secularism-এর বহু-মাত্রিকতা (multi-dimensionality) অনুমান করা যেতে পারে। সব মিলিয়ে বর্তমান আলোচনায় এ-কথাটি মনে রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, পশ্চিমি সেকুলারবাদের মূল কথাই হল ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির প্রাধান্যকে নিশ্চিত করা এবং ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের পৃথকীকরণকে উৎসাহিত করা। এখানে বলতে চাওয়া হয় যে, সেকুলারবাদ হল এমন একটি আদর্শ (ideal) যা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও তার প্রতিনিধিবর্গকে ধর্মীয় কোনও প্রতিষ্ঠান বা তাদের মুখপাত্রদের থেকে দূরে রাখতে প্রেরণা জোগাবে।

৫.৪ ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতা : বিশেষ ব্যঞ্জনা

পশ্চিমে যেভাবে 'দীপায়ন'-এর মূলবোধ (value)-এ জারিত হয়ে 'আধুনিক' (modernity)-র বৃহত্তর প্রেক্ষিতে সব ধরনের বিশ্বা-ব্যবস্থা (belif-system)-এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে যৌক্তিকতা (reason)-এর ভিত্তিভূমিতে সেকুলারবাদ (secularism)-এর আদর্শ (ideal) বিকশিত হয়ে উঠেছিল; ভারতে ঠিক সেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা'-র ধারণা গড়ে ওঠে নি। মূল ধারণার সঙ্গে কিছুটা সাযুন্য রেখেই প্রধানত ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের ভাবনাকে সক্রিয় করেই এখানে ধারণাটি রূপ পরিগ্রহকরে। 'বিশ্বাস-ব্যবস্থার ক্ষয় এবং যুক্তির জয়' এমনতরো বিশ্লেষণ ধারার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় ধর্ম পরিহার এবং সব ধর্মমতের সঙ্গে সমদূরত্ব (equi-distance)-এর নীতিটিই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। সহনশীলতা (tolerance)-এর ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'সবধর্ম সম ভাব'-এর অবস্থানটিই এখানে অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে।

পশ্চিমে সেকুলারবাদের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ছিল; ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিশেষত্ব অনুধাবনে ঠিক তেমনই এদেশের ইতিহাসের প্রেক্ষিতটি বুঝে নেওয়া জরুরি। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ হল সাম্প্রতিক ইতিহাস। সে সব ইতিহাসের গভীরে না গিয়েও বলা যায় যে, এদেশে ধর্মীয় বন্ধুত্ববাদের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সহাবস্থানের প্রক্রিয়া 'সহনশীলতা' (tolerance)-র আদর্শ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ধর্মীয় মতাদর্শের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সব ধর্মেই শান্তি-সম্প্রীতি পারস্পরিক সৌহার্দ্যের কথা বলা হয়েছে। ধর্ম মাত্রেই মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহেয় বিকাশ ও বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সহমর্মিতার বাণী প্রচারিত হয়েছে। এভাবেই ধর্মীয় সহনশীলতার আদর্শ ভারতীয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে কম বেশি ছন্দ-পত্তন ঘটলেও সহাবস্থানের পরিমন্ডলটি মোটের উপর বজায় থেকেছে। ভারতীয় প্রেক্ষিতে

পারস্পরিক সহনশীলতার এই ধারণাটিই এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়েছে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের পরিক্রময় বলা যায় যে, ব্রিটিশ আমলেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত পরিলক্ষিত হয়। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার নেতিবাচক প্রভাবসমূহ দানা বাঁধতে শুরু করে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস যেন এমনই ঘনীভূত হতে শুরু করে। অতিসরলীকরণ (oversimplification)-এর ভঙ্গিতে অনেকেই একে ব্রিটিশ শাসকদের অনুসূত 'বিভাজন ও শাসন' (divide and rule)-এর নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলেই মনে করেন। সেদিক থেকে বলা চলে যে, ভারতের মতো সুবিশাল ও জনবহুল দেশে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের লক্ষ্যেই ঔপনিবেশিক কৌশলের পরিনতিতেই এমনতরো সমস্যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের চিন্তা-কাঠামোকে গুরুত্ব দিয়ে ও বলতে হয় যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা বোধ করি সমাজের আরও গভীরে নিহিত রয়েছে। তার সামাজিক শিকড়ের সন্ধান বোধ করি অত্যন্ত জরুরি। ধর্মের আধারে তা উত্থাপিত হলে ও তার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রণোদশাগুলিও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেরিতে হলে ও এ বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানের কাজ বেশ কিছুদূর এগিয়েছে। অধ্যাপক বিপান চন্দ্র, অধ্যাপক রনবীর সিং প্রমুখ তত্ত্বকারদের হাত ধরে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা বর্তমানে অনেকটাই অগ্রবর্তী। বর্তমান পাঠ উপকরণে যে আলোচনার বিশেষ অবকাশ নেই। এখানে কেবল এতুটুকই বলার যে, ভারতীয় সমাজে সহনশীলতার আদর্শ এক মধ্যে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে এক ধরনের যোগসূত্র রচনা করেছে। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা সেই যোগসূত্রেরই অন্যতম উদ্ভাবন। এখানেও অবশ্য বিষয়টি মিলিয়ে ফেলা বা গুলিয়ে ফেলা সঙ্গত হবে না। সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলিকে গভীরভাবে পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সহনশীলতা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিশব্দ না কি পূর্বশর্ত—সেটাও বিশেষভাবে বিচার্য। তবে, সাধারণভাবে হলেও একথা অবশ্যই বলা যাবে যে, ভারতীয় প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ আমলে ঘনীভূত হয়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবর্তেই সহনশীলতার ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে 'সব ধর্ম-সম-ভাব'-এর আদর্শ অনুসরণে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণায় তাই পশ্চিমের মতো ধর্ম-বিরোধিতা বা ধর্ম বিষয়ে উদাসীনতা অথবা যুক্তিসর্বস্বতা—এসব ধারণাগুলি প্রধান নয়; এখানে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ, বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সমদূরত্ব (equi-distance) এবং সর্ব-ধর্ম-সব-ভাব-এর কথাগুলিই প্রধান। এখানে আপন ধর্মবিশেষে অটল থেকেও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুশীলন কোনও সমস্যা থাকার কথা নয়। ধর্ম প্রাণ মানুষ মাত্রেই যেমন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নন; স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান মানুষের ও সেই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ হতে কোনও বাধা নেই। ধর্মকে এখানে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখার প্রবণতাটিই প্রধান; রাষ্ট্রীয়/রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তা মিলিয়ে/মিশিয়ে ফেলাতেই প্রধান আপত্তি। উদাহরণ হিসেবে গান্ধিজির অভিমত এক্ষেত্রে স-বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে তিনি নিজেকে 'সনাতনী হিন্দু' বলে জাহির করতেন; কিন্তু এক সময়ে তিনিই আবার বললেন : ''If I were a dictator, religion and state world be separate,'' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি জানালেন যে, ''আমার ধর্মে আমি শ্রদ্ধাশীল; তারজন্য আমি মৃত্যুবরণ করতেও পারি। কিন্তু সেটি আমার ব্যক্তিগত বিষয়। রাষ্ট্রের সেখানে করণীয় কিছু নেই। কেবল মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ (secular) কল্যাণের বিষয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ধর্মের বিষয়টি সকলেরই ব্যক্তিগত ক্ষেত্র।

এরকম আলোচনা থেকে ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা সম্ভব হলেও তার মধ্যে নিহিত সমস্যা বড়ো কম নয়। ভারতীয় সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুশীলনের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা যেটি করে তার যথার্থ অর্থ নিরূপনের। এক্ষেত্রে 'নানা মুনির নানা মত' সব সময়ই আমাদের তাড়া করে ফেরে। কোনটি 'প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং কোনটিই বা 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষকরণ' তা নিয়ে বিভ্রান্তি ও শুরু কম নয়। আসলে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যেকার এক ধরনের আপাত: বিষয়টি সংশ্লেষ্ট (A kind of paradoxical ....society relationship) এ ধরনের বিতর্ক ও বিভ্রান্তির এক উধর ক্ষেত্র। আমাদের সমাজ কাঠামোটি ধর্ম ও জাতপাতের নানা বিভাজনে গ; রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্য ও স্বাধীনতার বাগাড়ম্বর।

অন্যভাবে বলা যায় যে, ঐতিহ্যপরায়ণ এক সমাজে (Traditionally oriented society) আধুনিকিকরণ অনুসারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা (modernized state-...) -এর ধারাবাহিক টানাপোড়েন বিভ্রান্তিকে আরও ঘনীভূত করে তোলে। এখানে অবশ্য বিষয়টি আরও জটিল হয়ে পড়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনুধাবনের প্রক্রিয়ায়। সাধারণভাবে সামাজিক রূপান্তরে রাষ্ট্রকে অনুঘটকের ভূমিকায় দেখার প্রবণতা বিদ্যমান হলেও রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সংশ্লেষের জটিল রূপটি এখানে বিচার্য। নির্বাচনী রাজনীতির প্রেক্ষিতে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি বিবেচনায় আনলে সমস্যার স্বরূপটি কম বেশি বোধগম্য হয়। ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নটি তখন আর নিছক 'বিশ্বাস ব্যবস্থা'-র পক্ষে বিপক্ষে অবস্থিত না হয়ে ক্ষমতা দখলের প্রকরণ হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে সামাজিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদিতা এবং বিজ্ঞানমুখীনতার ব্যাপারটি তখন ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে।

৫.৫ ভারতীয় সংবিধানে ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শ :

ভারতীয় সংবিধানে ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শ অনুশীলনে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরম্পরাটি অনুধাবন করাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় যে বিষয়টি এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল ব্রিটিশ শাসনকালে ঘনীভূত হয়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ঐতিহাসিক বাতাবরণ। ভাবতে খারাপ লাগলেও এক্ষেত্রে ধর্মের এক ধরনের নেতিবাচক (negative) প্রভাবের কথা এসেই পড়ে, যা কেবল সাম্প্রদায়িক তিক্ততার বাতাবরণই সৃষ্টি করে নি সামগ্রিকভাবে পারস্পরিক সংঘাতের পথে বেয়ে দেশভাগকেও অনিবার্য করে তুলেছে। বলা বাহুল্য যে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়ার এসবেরই কম বেশি প্রভাব পড়েছে।

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৬-এর ৯ই ডিসেম্বর দিল্লীর 'কন্সস্টিটিউশন হল' (Constitution Hall)-এ। মুসলিম লীগের সদস্যগণ এই অধিবেশনে যোগ দেন নি। পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে তারা তখন অনড় ছিলেন। অবশেষে, নানা ধরনের টানাপোড়েনের পথ বেয়ে দেশভাগের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা আসে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ এবং তার ফলে সৃষ্ট সংখ্যালঘু সমস্যার বিশেষ চরিত্র নিয়ে সংবিধানে রচয়িতাদের নতুন করে ভাবতে হয়। নবগঠিত রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সহবস্থান এবং তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা যেটি থেকেই এদেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' (Secular State) গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য যে, তাৎক্ষণিক বিচারে এটি ছিল গান্ধি নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত নীতিরই প্রতিফলন। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা সঙ্গত হবে যে, মূল সংবিধানে কোথাও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি। এই অনুল্লেখ কোনও অনবধানতাজনিত ভ্রান্তি না; সংবিধান রচিয়তাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গণপরিষধে বিষয়টি অধ্যাপক কে. টি. শাহ একাধিকবার সংশোধনী আকারে এটি উত্থাপন করলেও আম্বেদকরের আপত্তিতে তা খারিজ হয়ে যায়। আম্বেদকরের বক্তব্য অনুসারে সংবিধানে আলাদা করে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংযোজন অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য মাত্র। কারণ, সংবিধানের প্রস্তাবনীতেই চিন্তা, বাক্য, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা স্বীকৃত। মর্যাদাও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সকলের সমতার কথাও সেখানে উল্লিখিত। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকার হিসেবে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সংস্কৃতি, শিক্ষা-বিষয়ক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এসব থেকে ভারতরাষ্ট্রের 'ধর্মনিরপেক্ষ' চরিত্র স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সংবিধান সভা আম্বেদকরের এই যুক্তি অনুমোদন করেছে। তাই, সংবিধানে 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা' শব্দটি সংযোজিত না হলেও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সংবিধানের প্রস্তবনায় মূল অংশে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তা সংবিধানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। সংবিধানিক ব্যবস্থাপনায় পর্যালোচনায় তিন ধরনের সম্পর্কের ব্যাখ্যা লক্ষ্যণীয় এক, ধর্ম ও ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্ক, দুই ব্যক্তি ও ব্যক্তির সম্পর্ক এবং তিন, কষ্ট ও ধর্মের আন্তঃসম্পর্ক সাম্যের অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বর্ণনায় তা বিবৃত। সেখানে অবশ্য রাজনৈতিক মানেগতভাবে

ব্যক্তি ও ধর্মের পৃথকীকরণ গ।

আগেই বলাহয়েছে যে, ধর্মীয় সম্প্রীতির ঐতিহ্য ভারত-ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তদনুযায়ী 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ভারতীয় সংবিধানের ও মূল আদর্শ বলে পরিগণিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও সংবিধান প্রণেতাগণ বা পরবর্তী সময়কালে রাষ্ট্র পরিচালকবৃন্দ 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র ধারণাটি সম্পর্কে কোথাও সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন নি। রাজনৈতিকভাবে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে বা ধর্মের রাজনীতিকরণ প্রতিহত করতে; অথবা ধর্মীয় মৌলবাদের প্রতিষেধক এক রাজনৈতিক ভাবনা হিসেবে বিভিন্ন বক্তব্য সাধারণভাবে উত্থাপিত হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনায় বিষয়টি সামনে এসেছে। এক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তরফলক (milestone)টি হল ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধন আইন [(Constitution 42nd Amendment Act) 1976] যার মধ্য দিয়ে প্রস্তাবনার গোঁড়ার দিকেই 'ধর্ম নিরপেক্ষ' শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। মূল সংবিধানে শব্দটির যেখানে ছিল Sovereign Democratic Republic সংশোধনের পরে সেটি দাঁড়ায় Sovereign Socielist Secular Democratic Republic। সংযোধনীর কারণ নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। তবে, সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভারত রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটির উপরে বিশেষ গুরুত্ব গগ জন্যই এই সংশোধনী। দুর্গাদাস বসু এ প্রসঙ্গে নিয়েছেন: The secular nation of our constitution has been further highlighed by inserting this word in the preamble। শ্রী বসু'র এই মন্তব্য থেকে একথাটা পরিস্কার যে এই সংশোধনী সংবিধানে নতুন কোনও ধারণায় সংযোজন করে নি; 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র বিদ্যমান ধারণাটিকেই স্পষ্টতর করেছে মাত্র।

ভারত রাষ্ট্রে ধর্ম-নিরপেক্ষ চরিত্র নিয়ে আলোচনার নতুনতর প্রেক্ষিত রচিত হয়েছিল ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের কাঠামোটি ভেঙে ফেলার প্রেক্ষিতে। স্বাভাবিক কারণেই এ বিষয়ে সাংবিধানিক আদর্শ ও তা রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালকদের ভূমিকা নানা প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি হয়েছিল। তারই সূত্র ধরে ধর্মনিরপেক্ষতা-র আদর্শ ব্যাখ্যার নতুনতর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। প্রসঙ্গকালে ধর্মীয় পুর্নজাগরণ (religions revivulism) ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা (Psendo Secularism) এবং 'তোষণনীতি' (Appeasement) সম্পর্কিত নানা কথা ও উঠতে থাকে। সব মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে আলোচনা নতুন মাত্রা পায়। পরবর্তী রাজনৈতিক প্রবাহে সাংবিধানিক বিন্যাসে কোনও পরিবর্তন না ঘটলেও ভারতে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বি.জে.পি.-র উত্থান এবং বিশ্বব্যাপী নানা পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় নতুনতর আলোচনার বাতাবরণটি বিকশিত হয়ে ওঠে।

৫.৬ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মনিরপেক্ষকরণ :

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)-র প্রশ্নটিকে একদিকে যেমন একটি আদর্শ (ideal) হিসেবে ব্যাখ্যার প্রবণতাই সমচিন; তেমনই একে একটি নীতি (policy) এবং তা রূপায়ণের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার প্রশ্নটিও সাম্প্রতিককালে গুরুত্ব অর্জন করেছে। Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি যেহেতু প্রধানত একটি আদর্শ (ideal) হিসেবেই পরিগণিত তার প্রয়োগিক দিকটিকে তাই ধর্মনিরপেক্ষকরণ (Secularzatism) বলা হয়ে থাকে। বলতে চাওয়া হয় যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণের প্রক্রিয়াটিই আসলে ধর্মনিরপেক্ষকরণ। আশা করা হয় যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব হ্রাস পাবে এবং যুক্তিবাদী সমাজমনস্কতা প্রাধান্য পাবে এবং তার মধ্যে দিয়েই কাঠামোগত রূপান্তর ও ত্বরান্বিত হবে। ধর্মনিরপেক্ষকরণের এই প্রক্রিয়া ব্যক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে; তেমনই রাষ্ট্রের ভূমিকাও এখানে কম নয়। তবে, এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ (civil society) এর ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

ধর্মনিরপেক্ষকরণের এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে সাধারণভাবে বলা চলে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি প্রয়োগের ক্ষেত্রটি ব্যাপক এবং জটিল। সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যমান আইন-কানুন এক সহায়ক সন্দেহও

নেই; কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হল তার প্রায়োগিক দিকটি সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া (political process)-টি অনুধাবনের প্রশ্নটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। সেই পথেই নাগরিক সমাজ (civil society)-এর কথা উত্থাপিত হয়ে থাকে। কারও সুস্পষ্ঠভাবে বলা চলে যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের প্রাক্‌গত হল ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক সমাজ; তাই নাগরিক সমাজের ধর্মানিরপেক্ষকরণের বিষয়টি ও এখানে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এরকম আলোচনার সূত্রে ধরেই রাষ্ট্র ও সমাজের বৈপরীত্যমূলক সম্পর্ক (paradoxical state society relationship)-এর আলোচনা নতুন মাত্রা পায়। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনাকে বিশেষ একটি ধরা-ধারক ছন্দের মধ্যে আটকে রেখে এই প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করা অসম্ভব। সাম্প্রতিক সময়ে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রভাবে নতুনতর তাত্ত্বিক আবহে তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে নতুনভাবে আলোকপাতের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সেই সূত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মনিরপেক্ষকরণের আলোচনায় নানা ধরনের বিতর্ক ও ব্যাখ্যা চাড়া দিয়েছে। ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনায় সাম্প্রতিককালে তাই ছক-ভাঙার প্রবণতা লক্ষ্যণীয় হয়েছে। এরকম একটা প্রেক্ষিতেই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষকরণের প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে নতুনতর আলোচনা সূচিত হয়েছে। সেখানে যেমন সাম্প্রদায়িকভাবে বিভাজিত সমাজ-কাঠামোর প্রেক্ষিতে একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণের আলোচনা প্রাধান্য পাচ্ছে; তেমনই আবার জনসমাজের ধর্মীয় পরিসরের সঙ্গে পৌরজীবনের (civil spheres)-এর সীমারেখা নির্ণয়ের সমস্যা (problems of demereating between civil and religions spheres of life) নিয়ে নানা বিতর্ক ও দানা বেঁধে উঠছে। একই সঙ্গে বিদ্যমান আইনগত কাঠামো নিয়েও নানা প্রশ্নের অবতারনা লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে। একদেশ, এক আইনের ধারণা (common law of the land বা uniform civil code) যত বেশি সম্প্রসারিত হচ্ছে, ব্যক্তিগত আইন (Private laws) বা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য বিশেষ আইন ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কও তত বেশি জোরদার হয়ে উঠছে। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে রাজনীতির সামাজিক ভিত্তিটি পুনরনুশীলনের প্রবণতাটি সম্প্রসারিত হচ্ছে। বৃহত্তর সমাজে ধর্মনিরপেক্ষকরণের ধারণার বিপ্রতীপে তথা কথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জন (De-secularization)-এর কথাও বিভিন্নভাবে সামনে এসে পড়ছে। শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, গণ মাধ্যমের ধর্মনিরপেক্ষকরণের প্রক্রিয়াটি যেন এমনই আরও জটিল হয়ে পড়ছে। আগের মতো বিজ্ঞানমনস্কতার আধারে ধর্মনিরপেক্ষতার সরলীকৃত ব্যাখ্যা আর যেন যথেষ্ট বলে বিবেচিত হচ্ছে না। নির্বাচনী রাজনীতির গতিপ্রকৃতি যেন সেদিকেই দিক নিদের্শ করছে। এরকম একটা সামগ্রিক আবহে 'ধর্মনিরপেক্ষকরণ'-কে আমাদের অনুধাবন করতে হয় একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া হিসেবে—সাধারণভাবে যার ফলে ধর্মীয় পরিচিতির গুরুত্ব পায়; প্রথাগত আইনের স্থানে আধুনিক বিচার প্রক্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়; সামগ্রিক জীবনবৃত্তে আধুনিক ভাবনার প্রসার ঘটে। বলা বাহুল্য যে, এসব কথার মধ্যেও অতিসরলীকরণের ঝোঁকগুলি স্পষ্ট এবং এর সবগুলিতেই বিতর্কের নানা অবকাশ থেকেই যায়। গভীর আলোচনায় তাই উঠে আসে সমাজ-সভ্যতার সাংস্কৃতিক ও মনতাত্ত্বিক নানা উপদানের কথা; বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিশেষত্বের কথা; 'রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা'-র নানা টানাপোড়েনের কথা। এসব আলোচনার সূত্র ধরেই ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার বিশিষ্টতার কথাও নতুনভাবে উত্থাপিত হয়। বলতে চাওয়া হল যে ''Secularism is a concept of western origin; it is at adds with Indian genious" এখানেই শেষ নয়। Anti-secularism নিয়ে নানা কথাও আলোচনায় এসে পড়ে। শুরু হয় জমজমাট বিতর্ক। সাম্প্রতিককালে তা বেশ ঘনীভূত এবং বর্তমান পাঠ-উপকরণের তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৫.৭ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা : সাম্প্রতিক বিতর্ক

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্র উদ্ঘাটন করতে গিয়ে রাজীব ভার্গব তার বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। The Distinetivenes of Indian Secularism শীর্ষক নিবন্ধে তিনি প্রথমেই তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের সচেতন

করতে চেয়েছেন। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে তিনি distinet শব্দটি ব্যবহার করলেও তাকে unique বলেন নি, কারণ পৃথিবীর সব দেশেই Secular বলতে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণকে বোঝায়; এবং সেই অর্থে তা universal। ভারতের ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম হতে পারে না। দ্বিতীয় যে কথাটি তিনি বলেছেন, তা হল এই যে আমাদের একটি সাধারণ ভ্রান্তি অনেকসময় আমাদের বিপথগামী করে। আমরা ভেবে বসি যে, কোনও একটি ধারণা বা মতবাদ (doctovine) কতকগুলি নির্দিষ্ট ধরা বাঁধা গতেই (fixed context) আবর্তিত হবে। স্থান কাল ভেদে তার বিশিষ্টতা অনুধাবন অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয় যে বিষয়টি তিনি উত্থাপন করেছেন তা হল এই যে, যে কোনও বিষয়কে 'Western-modern' এবং 'indigeneous-traditional'-এ রকমের দ্বিত্বে বিভাজিত করে বোঝার চেষ্টাটি বোধ করি সঙ্গত নয়। তার যুক্তি এই যে, পশ্চিমে ও সব দেশে secularism-এর ধারণা একই রকম নয়। আসলে বিভি্ন্ প্রেক্ষিতে তার চেহারা-চরিত্রের ভিন্নতা প্রতিপন্ন করতেই তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাগত বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে তিনি রাষ্ট্র ও ধর্মের principled distance-এর কথায় যেমন এসেছেন; তেমনই উত্থাপন করেছেন 'প্রেক্ষিতগত ধর্মনিরপেক্ষতা' (contextual secularism)-এর কথা।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমিলা থাপর আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাঁর লিখিত একটি নিবন্ধের নামকরণেই প্রশ্ন চিহ্নটি সুস্পষ্ট। নিবন্ধের শিরোনাম Is secularism ahien to Indian civilization? ভারতে সেকুলারিজম এর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত: This is essential to understanding that the secularizing process in India will inevitably be different from that of Europe although the difference does not annual secularism। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ (religions nationalism) এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ (cultural nationalism)-এর কথায় এসেছেন এবং দেখতে সচেষ্ট হয়েছে যে কিভাবে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে আত্মস্যাৎ করার চেষ্টা করে। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির 'অপরাপর' দিকগুলির গুরুত্ব নির্দেশ করে সেগুলির আলোচনাকে উৎসাহিত করতে চেয়েছেন। তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিমত 'Secularism is not just the confrontation between religion and the state. It re.... new initiatives by the state and by the citizens in relation to the essentials of a secularised society"।

অচিন বানাইল ও পশ্চিমের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত ভাবনার সঙ্গে ভারতীয় সমাজ বাস্তবতার পার্থক্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতাকে একই সঙ্গে একটি আদর্শ (ideal) ও একটি নীতি (policy) আখ্যা দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষকরণের প্রক্রিয়াটিকে জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রক্রিয়ার ধরণ-ধারণগুলির উল্লেখ্য করে তিনি ভারতের বিশেষ প্রেক্ষিতটি মনে রেখে তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন। বানাইকের দৃষ্টিতে ভারতীয় বাস্তবতা অনুসরণে ধর্মনিরপেক্ষতার তিনটি অর্থ: এক, ধর্মীয়, স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিতকরণ; দুই নাগরিকত্বের প্রশ্নটিকে প্রাধান্যদান (primary or citizenship); এবং তিন, রাষ্ট্র থেকে ধর্মের পৃথকীদান। ডোনাল্ড স্মিথ ও ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার এক যৌক্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। Secular state বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তিনটি প্রাকপর্বের উল্লেখ করে বানাইকের মতোই তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা, নাগরিকতা ও ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের উপর জোর দিয়েছেন। ব্যাখ্যা করে তিনি জানিয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে রাষ্ট্র, ধর্ম ও ব্যক্তির আন্তসম্পর্ক এখানে প্রধান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্কে তাঁর মতে ধর্মের কোনও স্থান নেই; সেখানে ব্যক্তি নাগরিক মাত্র। অবশ্য রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি সন্দিহান; তা সত্ত্বেও ধর্ম বিষয়ে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার দিকটিই তার মতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত ধারণাকে ঘিরে উদ্ভুত বিতর্কে অমর্ত্য সেনের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হয়। তিনি জানিয়েছেন যে, সাধারণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে আমাদের ধ্যান ধারণার যে অসম্পূর্ণতা,

তার থেকেই বিতর্ক এবং বিভ্রান্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেসব বিষয়গুলিকে ঘিরে গ আপত্তি দেখা যায়, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Argumentative Indian-এর Secularism and its discontents শীর্ষক অধ্যায়ে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন। সেখানে তিনি ছয় ধরনের সমালোচনা (critique)-এর উল্লেখ করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে (i) non-existence' critique, (ii) Favounitism critique, (iii) power identity critique, (iv) Muslim secularism critique, (v) Anti Modernist critique এবং (vi) Cultural critique। এরকম আট বর্জন সমালোচনার বিস্তারিত আলোচনায় ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নের প্রায় বেশির ভাগ বিতর্কের এলাকাগুলি তিনি ছুঁয়ে গেছেন। সব শেষে এ বিষয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: "The winter of our discontext might not be giving way at present to a glorious summer', but the political abandonment of secularism would make India for more wintory than it currently is."

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে আশীষ নন্দী এবং টি. এন. মদনে বক্তব্য আরও বেশি বিতর্কের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেছে। উভয়েই কমবেশি একীকরণে 'আধুনিক বিরোধী' (anti-modernist) ও 'নয়া গান্ধিবাদী' (New Gandhian) অবস্থান থেকে বিষয়টি বিচারে উদ্যোগী হয়েছেন। আশীষ নন্দী নিজেকে একজন 'anti secularism' আখ্যা দিয়ে দাবি করেছেন যে, ভারতীয় সমাজ বাস্তবতায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ও রাজনৈতিক সম্ভাবনা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। 'নেহেরু-অনুসারী ধর্মনিরপেক্ষতা' (Nehrurian Secularism)-কে পশ্চিমী 'আধুনিক'-র উপজাত এবং ঔপনিবেশিক মনোভঙ্গি (colonised mind) প্রসূত বলে মন্তব্য করে তিনি ভারতের 'সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব' (cultural uniqueness)-এ মনোনিবেশ করতে চেয়েছেন। একদিকে তিনি যেমন আধুনিক সমাজ-সংস্কৃতির সমালোচনা করছেন। অন্যদিকে তেমনই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার ও সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে হিন্দুত্ব, ইসলাম এবং শিখ নৈতিকতার ধারণা থেকে অনেক কিছু লিখতে হবে। বিপরীত পক্ষে, ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কাছে তাদের শেখার কিছু নেই। বিদ্যমান ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের ধর্মীয় সহনশীলতার ধারণাকে বিকল্প বলে মনে করেছেন। এক কথায় বলা যায় যে, নন্দী পশ্চিমী রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা, যা পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবিদের উদ্ভাবন—তার স্পষ্ট সমালোচনা তিনি জোর দিয়েছেন এমন এক অপশ্চিমী ধর্ম, সমাজকেন্দ্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপর যা দক্ষিণ এশীয় বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

টি. এন. মদন ও ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার গতিপ্রভৃতি নিয়ে সমালোচনায় মুখর হলেও তিনি কিন্তু তাকে পুরোপুরি বর্জন করার কথা বলেন নি। তিনি ভারতের মতো বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশে যান্ত্রিকভাবে এই ধারণা প্রয়োগের সমস্যাগুলি আলোচনা করতে গিয়ে তত্ত্বও বাস্তবের অসঙ্গতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্র ও ধর্মের সম-দূরত্ব নীতি (policy of equi-distance) রূপায়ণের সমস্যাগুলি উল্লেখ করে ধর্মীয় মৌলবাদ ও বিভেদপন্থা বোধ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যবস্থার দিকে তিনি অঙুল নির্দেশ করেছেন। ভারতীয় সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেক্ষেত্রে আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়াকে সুহরকমর তাগিদে গান্ধিবাদের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিকল্প ধারণা গড়ে তোলার উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে সাম্প্রতিক এসব তর্ক বিতর্কের মধ্যে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চ্যাটার্জি-র বক্তব্য ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আশীষ নন্দী, টি. এন. মদনের মতো তিনিও মনে করেন যে, পশ্চিমী আধুনিক (Western modernity)-র সঙ্গে সম্পক করে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতেই সমস্যাটি গভীর হয়েছে। বিদ্যামান ব্যবস্থা হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ (Hindu majaritarianism) যেভাবে হিন্দুত্বের দাবিতে সামনে এসে 'ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা' (Psendo-secularism)-র ধারণাকে জোরদার করেছে, পরিস্থিতি তাতে আরও জটিল হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমী

ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণআ এদেশে এ বিষয়ে কিভাবে ভারতীয় বিকল্প গড়ে তোলার অন্তরায় হয়েছে তা দেখতে গিয়ে ভারতীয় বাস্তবতার ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যাগুলি মেলে ধরেছেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে সমরূপতা (homogenization)-র সমস্যা মোকাবিলার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রীকরণ (democratization)-এর প্রক্রিয়াকে সবিস্তারে বিকশিত করে তোলার প্রক্রিয়ার উপরেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যা সম্পর্কে এমনতরো নানা বিতর্কের প্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে বলি যে, আশীষ নন্দী এবং টি. এন. মদন যেমন একধরনের আধুনিক বিরোধী এবং নয় গান্ধিবাদী (anti-modernist and Neo-Gandhian) সমালোচনা (critised) গড়ে তুলেছেন। অচিন বানাইক চেয়েছেন বিকল্প একটি মার্কসীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। রাজীব ভার্গব নন্দী ও মদনের 'নয়া-গান্ধিবাদী' ব্যাখ্যার সমালোচনা করে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিশিষ্টতার উপর জোর দিয়ে 'প্রেক্ষিত-গত' (contextual) তত্ত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছেন। অমর্ত্য সেনের ভাবনায় উঠে এসেছে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে আমাদের ভাবনার অসম্পূর্ণতার কথা এবং তৎপ্রসূত্র বিতর্ক, বিভ্রান্তির কথা। সমস্যাগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েও তিনি সাবধান করে বলতে চেয়েছেন ভারতে মতো দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বিকল্পহীনতার কথা। পার্থ চ্যাটার্জি ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার 'ভারতীয় বিকল্প' সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিন্যাস (re-configuration)-এর সম্ভব বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে এসব বিতর্কসমূহের প্রেক্ষিতে সব শেষে অর্থাৎ বলতে হয় য়ে, এগুলিকে সদর্থক দৃষ্টিতেই বিবেচনা করা উচিত। কারণ এই বিতর্ক ভারতে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে সহায়ক করে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এটাই যে, বিভিন্ন বিষয়ে মতামতগত ভিন্নতা সত্ত্বেও বেশির ভাগ চিন্তাকেই ভাবনাকেই ভারতকে একটি সংঘবদ্ধ বহুত্ববাদী সমাজ হিসেবেই দেখার প্রধানতা বিদ্যামান। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সমূহের সমানাধিকারের দাবি ও অধিকাংশ তত্ত্বকারই স্বীকার করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যার মত-পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজের গণতন্ত্রীকরণের প্রশ্নটি ও তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার 'ভারতীয় বিকল্প' নিয়ে ভাবনা চিন্তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও ভারতের মতো দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ করি কোনও বিকল্প নেই।

৫.৮ উপসংহার :

ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত বর্তমান পাঠ-উপকরণে অনেকটা ব্যাপক পরিসরে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। প্রথমেই 'ধারণাগত স্বচ্ছতা' (conceptual clarity)-র উপর গুরুত্ব আরোপ করে ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমে যেভাবে ধারণাটির উত্তর ও বিকাশ ঘটেছে তার একটি রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে। ধারণাগত ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা নির্ণয় করে তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করে ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় তার বিশেষ প্রণোদনাটি বুঝে নেওয়াই যেহেতু এই পাঠ-উপকরণের প্রধান লক্ষ্য, তাই ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে পৃথক আলোচনার অবতারনা কম হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যক্ত করতে গিয়ে একদিকে যেমন তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি মেলে ধরা হয়েছে, তেমনই সাংবিধানিক বিধি-ব্যবস্থাটি ও সংক্ষেপে হলেও উল্লিখিত হয়েছে। একথাটা জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে যে, মূল সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি উল্লিখিত না হলেও সংশ্লিষ্ট আদর্শটি কিভাবে প্রথম থেকেই সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীয় মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির সংযোজনের কথাও পাঠ-উপকরণে আলোচিত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কিভাবে এবং কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা বুঝে নেওয়ার তাত্ত্বিক প্রকরণ হিসেবে একটি আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও একটি নীতি প্রক্রিয়া হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষকরণ-এর কথা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাঠ-উপকরণে বিশেষ গুরুত্ব

আরোপ করা হয়েছে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক অনুসারে আলাপ আলোচনায়। সব শেষে একথাটা বেশি করে বলা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের আলেনাচয় বাধাঁ ধরা ছকের মধ্যে আটকে না থেকে সাম্প্রতিক বিতর্কে গভীরে প্রবেশ করা অবশ্য কর্তব্য। পাঠক্রমের প্রয়োজনে তা যেমন জরুরি, তেমনই বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য ও তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৯ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

১। একটি রাজনৈতিক ধারণা হিসেবে সেকুলারবাদ/ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব ও বিকাশের রূপরেখা উপস্থাপিত করুণ।

২। ভারতীয় প্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার বিশেষ ব্যঞ্জনাগুলি চিহ্নিত করুণ এবং এই প্রসঙ্গে পশ্চিমী সেকুলারবাদের সঙ্গে তার পার্থক্যগুলি নির্দেশ করুণ।

৩। ভারতীয় সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র আদর্শ কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থার আলোক তা ব্যাখ্যা করুণ।

৪। ধর্মনিরপেক্ষতা (secularism) ও ধর্মনিরপেক্ষকরণ (secularization)-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুণ। স্বাধীনতা উত্তরকালে ধর্মনিরপেক্ষকরণের প্রক্রিয়ায় ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুণ।

৫। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভৃতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক বিতর্ক সমূহের উপর একটি নিবন্ধ রচনা করুণ।

৬। সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রেক্ষিতে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে আশীষ নন্দী ও টি. এন. মদনের বক্তব্যের মূল্যায়ন করুণ।

৫.১০ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

i. Bhargava, Rajeev. (Ed.). (1998). *Secularism and Its Critics.* Delhi: Oxford University Press.

ii. Jayal, Niraja Gopal., & Mehta, Pratap Bhusan. (Ed.). (2010). *The Oxford Companion to Politics in India.* New Delhi: Oxford University Press.

iii. Sen, Amartya. (2006). *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity.* Penguin Books.

iv. Smith, Donald E. (1963). *India as a Secular State.* Princeton University Press.

v. T.N.Srinivasan (Ed.). (2007). *The Future of Secularism.* New Delhi: Oxford University Press.

vi. Vanaik, Achin. (1997). *Communalism Contested: Religion, Modernity and Secularization.* New Delhi: Vistar Publications.

vii. Chandra, Bipan. (1984). Communalism in Modern India. New Delhi: Har-Anand.

CC 1.5

Unit-6

Ecofeminism with reference to Vandana Shiva

Contents

6.1 Objectives
6.2 Introduction
6.3 Background to Vandana Shiva's Ecofeminism
6.4 Ecofeminism
6.5 Contemporary Relevance of Ecofeminism
6.6 Conclusion
6.7 Summary
6.8 Self Assessment Questions
6.9 Suggested Readings

6.1 Objectives

The primary objectives are to introduce the readers to some of the ideas and concepts related to Ecofeminism with reference to Vandana Shiva. The objectives are:

1. Dr. Vandana Shiva is a woman whose work is focused on embracing not only the principles of feminism, but also the principles of ecology.
2. She sees these two movements as interconnected and believes that the worldview that causes environmental degradation and injustice is the same worldview that causes a culture of male domination, exploitation, and inequality for women.
3. Both her activism and theory has had a global and concrete focus. Her work has dealt with "third world" women, whose lives are adversely affected by the forces of corporate globalization and colonialism.
4. From Shiva's perspective, women's liberation cannot be achieved without a simultaneous struggle for the preservation and liberation of all life on this planet from the dominant patriarchal/capitalist worldview.

6.1 Introduction

Ecofeminism" was a term first used by Francoise D'Eaubonne in 1980 and gained popularity in protests and actions against continued ecological disaster.Ecofeminism is a movement that sees a connection between the exploitation and degradation of the natural world and the subordination and

oppression of women. It emerged in the mid-1970s alongside second-wave feminism and the green movement. Ecofeminism brings together elements of the feminist and green movements, while at the same time offering a challenge to both. It takes from the green movement a concern about the impact of human activities on the non-human world and from feminism the view of humanity as gendered in ways that subordinate, exploit and oppress women.Women are often the people who are most directly involved with subsistence work, and are the safeguards of natural resources needed to sustain the family and community.The historical context that radicalized Vandana Shiva and many others was the Green Revolution and the vast globalization of the mid to late twentieth century. Shiva refers to this model of economic development as maldevelopment.

VandanaShiva gained a Canadian Ph.D. in theoretical physics. But as a youngmother concerned by the nuclear threat to life on Earth, she left her job andset up a Research Foundation for Science, Technology, and Natural ResourcePolicy in her hometown, Dehradun. Her first book, *Staying Alive: Women,Ecology, and Development,* was published by Zed Books in 1989. It isan empirical account of India's so-called Green Revolution, and its ultimatedevastation of food crops, soils and farmers' lives. *Ecofeminism,* co-authoredwith Maria Mies, appeared in 1993. Others include *Biopiracy,* a co-edited reader onbiotech in 1995; *Water Wars* in 2002; and *Earth Democracy* in 2005. Arecipient of many awards, Shiva lectures widely, and has been cited as one ofthe world's most influential women.A tireless author, speaker and activist, Shiva has written over 13 books that reveal the true impact of globalization on the lives of women and men in developing countries. She has founded several organizations, including The Research Foundation for Science, Technology, and Ecology, Navdanya, and BijaVidyapeeth, an organic farm and center for holistic living.From Shiva's perspective, women's liberation cannot be achieved without a simultaneous struggle for the preservation and liberation of all life on this planet from the dominant patriarchal/capitalist worldview. Shiva and other ecofeminists are explicitly anti-war and anti-capitalist, because both war and capitalism are seen as patriarchal structures. An international literature of ecological feminism today runs to many books and articles, and it is taught asa university major, as well as in courses on ecological ethics, social andpolitical thought, gender studies, human geography, environmentalhumanities and, most recently, political ecology.

Some ecofeminists focus on historical or conceptual explanations for the oppression of women and nature, such as the rationalist tradition of classical Greek philosophy that spawned the human/nature dualism (Val Pumwood), or the shift to a mechanistic worldview that accompanied the scientific revolution, sanctioning both unchecked industrial expansion and the subordination of women (Carolyn Merchant). Ecofeminists have also explored linguistic interconnections between the oppressions of women and nature, examining sexist-naturistlanguage that represents women, nonhuman animals, and the land as inferior to men/male-identified culture animalizing women and feminizing nature authorizes their inferior status and justifies their domination and exploitation (Carol Adams).Vandana Shiva, Maria Mies, and others also examine empirical evidence linking women, children, and people of color with various health and risk factors linked to environmental degradation as a result of pesticides and

other pollutants, or big-agro practices like the factory farming of animals. Shiva in particular argues in favor of the feminine as an ecological/conservation principle, in contrast to the Western agricultural development strategies that she terms maldevelopment. In sync with Shiva's criticisms of Western models of development, ecofeminist/poststructural philosophers of science critique Western views of knowledge production notions that knowledge is objective, knowers are rational/detached/objective observers, and that nonhuman nature constitutes a passive object of study. Sandra Harding emphasizes the social position of the knower as essential for evaluating knowledge claims.

6.2 Background to Vandana Shiva's Ecofeminism

The 'global' versus the 'local' now figures widely in many ecological and development discourses. A closer examination of these reveals that the interest groups that seek free access to all natural resources as well as to human labour and markets, often present themselves as guardians of the 'world community', 'global peace', 'global ecology' or of universal human rights and the free world market. The implicit promise of this globalism is that a 'free world market' will lead to world peace and justice. In the name of common or global goals, which de facto acknowledge the fact that we all are dependent on the same planet, they nevertheless claim the right to exploit local ecology, communities, cultures and so on. The victims are always local, for example, as is manifest in the aftermath of the Gulf War — a war justified by the apparently universal or global principle of justice, in the name of the 'world community', represented by the United Nations. The world was called upon to feel responsibility for liberating Kuwait from Iraqi occupation. But, it is clear that the victims of this 'liberation' are local: Iraqi and Kuwaiti women and children, the Kurds, and the Gulf region's environment.The new 'globalism' which emerged after the Gulf War — the 'New World Order'— was propagated by US President George Bush. With the end of the old superpower confrontation this New World Order is projected as a harbinger of world peace and harmony. But it is simply the Old World Order in a different garb. local and particular interests, by means of subsuming the multiple diversities of economies, cultures and of nature under the control of a few multinational corporations (MNCs), and the superpowers that assist them in their global reach through 'free' trade, structural adjustment programmes and, increasingly, conflicts, military and otherwise.In the dominant discourse the 'global' is the political space in which the dominant local seeks global control, and frees itself of any local and national control. But, contrary to what it suggests, the global does not represent universal human interest but a particular local and parochial interest which has been globalized through its reach and control. The G-7, the group of the world's seven most powerful countries, dictate global affairs, but the interests that guide them remain parochial. The World Bank does not really serve the interests of all the world's communities, but is an institution in which decisions are based on voting, weighted by the economic and political power of the donors. In this decision making, the communities who pay the real price, the real donors (such as the tribals of Narmada Valley), have no voice.

The independence movements against colonialism had revealed the poverty and deprivation caused

by economic drains from the colonies to the centres of economic power. The post-war world order which saw the emergence of independent political states in the South, also saw the emergence of the Bretton Woods institutions like the World Bank and the IMF which, in the name of underdevelopment and poverty, created a new colonialism based on development financing and debt burdens. The environment movement revealed the environmental and social costs generated by maldevelopment, conceived of and financed by these institutions. Protection of the environment now figures in the rhetoric and is cited as the reason for strengthening 'global' institutions like the World Bank and extending their reach accordingly.

In addition to the legitimacy derived from co-opting the language of dissent is the legitimacy that derives from a false notion that the globalized 'local' is some form of hierarchy that represents geographical and democratic spread, and lower order (local) hierarchies should somehow be subservient to the higher (global). Operationalizing undemocratic development projects was based on a similar false notion of the 'national interest', and every local interest felt morally compelled to make sacrifices for what seemed the larger interest. This is the attitude with which each community made way for large dams in post independent India. It was only during the 1980s when the different 'local' interests met each other nationwide, they realized that what was being projected as the 'national interest' were the electoral and economic interests of a handful of politicians financed by a handful of contractors and industrialists who benefit from the construction of all dams such as Tehri and the Narmada Valley project. Against the narrow and selfish interest that had been elevated to the status of the 'national' interest, the collective struggle of communities engaged in the resistance against large dams started to emerge as the real though subjugated common interest.

There are a number of people who interpret the end of the East-West confrontation as not only signalling the end of all socialist dreams and utopias but also of all universal ideologies based on a universal concept of human beings and their relation to nature and other human beings. These ideologies have been 'deconstructed' as being eurocentric, egocentric and — according to some feminists — androcentric, and materialist. The end of these ideologies is being proclaimed by post-modernist thinkers, who hold that the universalization of modernization — the European project of the Enlightenment — has failed. And there are environmentalists and developmentalists who argue that the emphasis on material or economic development and on emulation of the West's model of the industrial society has failed to appreciate that in most non-European societies culture plays a significant role. Moreover, they assert that the dualistic separation of economy and culture (or in Marxian terms of bases and superstructure) finds no resonance in most non modern societies. They further criticize the Western developmentparadigm on the grounds that the modernization strategy has resulted inthe destruction of cultural as well as biological diversity, to ahomogenization of cultures,on the one hand and of life forms according to the demands of profitorientedindustries, on the other. We share much of the criticism directed to the West's paradigm of development; we reject the homogenization processes resulting from the world market and of capitalist production processes. We also criticize the dualistic division between superstructure or culture and the economy or base. In our view, the

preservation of the earth's diversity of life forms and of human societies' cultures is a precondition for the maintenance of life on this planet.

But it is essential to beware of simply up-ending the dualistic structure by discounting the economy altogether and considering only culture or cultures. Furthermore, not all cultural traditions can be seen as of equal value; such a stance would simply replace eurocentric and androcentric and dogmatic ideological and ethical universalism with cultural relativism. This cultural relativism implies that we must accept even violence, and such patriarchal and exploitative institutions and customs as dowry, female genital mutilation, India's caste system and so on, because they are the cultural expressions and creations of particular people. For cultural relativists, traditions, expressed in language, religion, custom, food habits, man-woman relations are always considered as particular, and beyond criticism. Taken to extremes the emphasis on 'difference' could lead to losing sight of all commonalities, making even communication impossible. Obviously, cultural relativism, amounting to a suspension of value judgement, can be neither the solution nor thealternative to totalitarian and dogmatic ideological universalism. It is, in fact, the old coin reversed. It takes a liberal stance, but it should be remembered that European liberalism and individualism are rooted in colonialism, destruction of the commons, on wholesale privatization and on commodity production for profit. What must also be realized is that this new emphasis on the cultural, the local, and the difference, this cultural relativism, accords with MNCs' interests.While intellectuals may concentrate on culture and on differences, international capital continues with its expansion of production and markets, insisting on free access to all natural resources and life forms and to localized cultures and traditions and their commodification. Local cultures are deemed to have 'value' only when they have been fragmented and these fragments transformed into saleable goods for a world market. Only when food becomes 'ethnic food', music 'ethnic music', and traditional tales 'folklore' and when skills are harnessed to the production of 'ethnic' objects for the tourist industry, can the capital accumulation process benefit from these local cultures.

While local cultures are thus dissected and their fragments commodified, these atomized parts are then're-unified' in the global supermarket, thereby procuring a standardization and homogenization of all cultural diversity. Cultural relativism is not only unaware of these processes but rather legitimizes them; and the feminist theory of difference ignores the working of the capitalist world system and its power to transform life into saleable commodities and cash.To find a way out of cultural relativism, it is necessary to look not only for differences but for diversities and interconnectedness among women, among men and women, among human beings and other life forms, worldwide. The common ground for women's liberation and the preservation of life on earth is to be found in the activities of those women who have become the victims of the development process and who struggle to conserve their subsistence base: for example, the Chipko women in India, women and men who actively oppose mega dam construction, women who fight against nuclear power plants and against the irresponsible dumping of toxic wastes around the world, and many more worldwide.In the dialogues with such grassroots women activists cultural relativism does not enter. These women spell out clearly what

unites women worldwide, and what unites men and women with the multiplicity of life forms in nature. The universalism that stems from their efforts to preserve their subsistence — their life base — is different from the eurocentric universalism developed via the Enlightenment and the rise of capitalist patriarchy. This universalism does not deal in abstract universal human 'rights' but rather in common human needs which can be satisfied only if the life sustaining networks and processes are kept intact and alive. These 'symbioses or living interconnectedness' both in nature and in human society are the only guarantee that life in its fullest sense can continue on this planet. These fundamental needs: for food, shelter, clothing; for affection, care and love; for dignity and identity, for knowledge and freedom, leisure and joy, are common to all people, irrespective of culture, ideology, race, political and economic system and class.

In the usual development discourse these needs are divided into so-called 'basic needs' (food, shelter, clothing et al) and so-called 'higher needs' such as freedom and knowledge and so on. The ecofeminist perspective, as expressed by women activists recognizes no such division. Culture is very much part of their struggle for subsistence and life. They identify freedom with their loving interaction and productive work in cooperation with Mother Earth; knowledge is the subsistence knowledge essential for their survival. For women in the affluent North or in the affluent classes of the South, such a concept of universalism or commonality is not easy to grasp. Survival is seen not as the ultimate goal of life but a banality — a fact that can be taken for granted. It is precisely the value of the everyday work for survival, for life, which has been eroded in the name of the so-called 'higher' values.

6.3 Ecofeminism

The concept of Ecofeminism gained prominence when Vandana Shiva and Maria Mies gave a concrete shape to the concept in their book titled *Ecofeminism.* Ecofeminism was first published one year after the Earth Summit, where two important treaties were signed by the governments of the world: the Convention on Biological Diversity and the UN Framework Convention on Climate Change. There was no World Trade Organization. However, two years after Ecofeminism, the WTO was established, privileging corporate rights, commerce and profits, and further undermining the rights of the Earth, the rights of women and the rights of future generations. Ecofeminism raised the issue of reductionist, mechanistic science and the attitude of mastery over and conquest of nature as an expression of capitalist patriarchy. Today the contest between an ecological and feminist world-view and a worldview shaped by capitalist patriarchy is more intense than ever. Ecofeminism asked the questions from a woman's point of view. What could be an alternative? What would a new paradigm, a new vision be? This new vision is called the 'subsistence perspective'.Ecofeminists believe that women are nearer to this perspective than men — women in the South working and living, fighting for their immediate survival are nearer to it than urban, middle-class women and men in the North. Yet all women and all men have a body which is directly affected by the destructions of the industrial system. Therefore, all women and finally also all men have a 'material base' from which to analyse

and change these processes.Ecofeminism, ‘a new term for an ancient wisdom’ grew out of various social movements — the feminist, peace and the ecology movements — in the late 1970s and early 1980s. Though the term was first used by Francoise D’Eaubonne it became popular only in the context of numerous protests and activities against environmental destruction, sparked-off initially by recurring ecological disasters. The meltdown at Three Mile Island prompted large numbers of women in the USA to come together in the first ecofeministconference — ‘Women and Life on Earth: A Conference on Eco-Feminism in the Eighties’ — in March 1980, at Amherst. At this conference the connections between feminism, militarization, healing and ecology were explored.

Wherever women acted against ecological destruction or/and the threat of atomic annihilation, they immediately became aware of the connectionbetween patriarchal violence against women, other people and nature,and that; In defying this patriarchy womenare loyal to future generations and to life and this planet itself. Women have a deep and particular understanding of this both through our natures and experience as women.On the night of 2-3 December 1984, 40 tons of toxic gas was released from a Union Carbide pesticides plant in Bhopal, India; 3,000 people died during the disaster and of the 400,000 others who were exposed, many have since died, and the suffering continues. Women have been those most severely affected but also the most persistent in their demand for justice. The Bhopal Gas PeeditMahilaUdyogSangathan, has continued to remind the Government of India, Union Carbide and the world that they still suffer, and that no amount of money can restore the lives and health of the victims. As Hamidabi, a Muslim woman from one of the poor bastis which were worst hit in the disaster said, ‘We will not stop our fight till the fire in our hearts goes quiet — this fire started with 3,000 funeral pyres — and it will not die till we have justice.’

The women who were a driving force in movements against the construction of nuclear power plants in Germany, were not all committed feminists, but to them also the connection between technology, war against nature, against women and future generations was clear. The peasant women who actively protested against the proposed construction of the nuclear power plant at Whyl in South-West Germany also saw the connection between technology, the profit-oriented growth mania of the industrial system and the exploitation of the ‘Third World’. This connection was also most clearly spelt out by a Russian woman after the Chernobyl catastrophe in 1986: ‘Men never think of life. They only want to conquer nature and the enemy.’The Chernobyl disaster in particular provoked a spontaneous expression of women’s outrage and resistance against this war technology and the general industrial warrior system. The illusion that atomic technology was malevolent when used in bombs but benevolent when used to generate electricity for the North’s domestic appliances was dispelled. Many women too, also understood that their consumerist lifestyle was also very much part of this system of war against nature, women, foreignpeoples and future generations.The new developments in biotechnology, genetic engineering and reproductive technology have made women acutely conscious of the gender bias of science and technology and that science’s whole paradigm is characteristically patriarchal, anti-nature and colonial and aims to dispossess women of their generative capacity as it does the productive capacities of nature. The founding of the Feminist International Network of

Resistance to Genetic and Reproductive Engineering (fiNRRAGE) in 1984, was followed by a number of important congresses: 1985 in Sweden and in Bonn, 1988 in Bangladesh, and 1991 in Brazil. This movement reached far beyond the narrowly defined women's or feminist movement. In Germany women from trade unions, churches and universities, rural and urban women, workers and housewives mobilized against these technologies; their ethical, economic, and health implications continue to be hotly debated issues. This movement was instrumental in preventing the establishment of a 'surrogate motherhood' agency in Frankfurt. The ecofeminist principle of looking for connections where capitalist patriarchy and its warrior science are engaged in disconnecting and dissecting what forms a living whole also informs this movement. Thus those involved look not only at the implications of these technologies for women, but also for animals, plants, for agriculture in the Third World as well as in the industrialized North. They understand that the liberation of women cannot be achieved in isolation, butonly as part of a larger struggle for the preservation of life on this planet.

As women in various movements — ecology, peace, feminist and especially health — rediscovered the interdependence and connectedness of everything, they also rediscovered what was called the spiritual dimension of life — the realization of this interconnectedness was itself sometimes called spirituality. Capitalist and Marxist materialism, both of which saw the achievement of human happiness as basically conditional on the expansion of material goods' production, denied or denigrated this dimension.The desire to recover, to regenerate this wisdom as a means to liberate women and nature from patriarchal destruction also motivated this turning towards spirituality. The term 'spiritual' is ambiguous, it means different things to different people. For some it means a kind of religion, but not one based upon the continuation of the patriarchal, monotheistic religions of Christianity, Judaism or Islam, all of which are arguablyhostile to women and to nature vis-a-vis their basic warriortraditions.The ecological relevance of this emphasis on 'spirituality' lies in therediscovery of the sacredness of life, according to which life on earth can be preserved only if people again begin to perceive all life forms as sacred and respect them as such.

6.4 Contemporary Relevance of Ecofeminism

Various facets to the Ecofeminism have emerged as a result of prolonged pondering over the years. Two prominent facets are Political perspective and Ethical perspectives of Ecofeminism. Feminist political philosophy critiques ways in which traditional understandings of the political world, including the nature of the public sphere, freedom, democracy, political speech, solidarity, and participation, fail to adequately address feminist concerns (see entry on feminist political philosophy). Ecofeminist political philosophy tends to expand these critiques to include ecologically informed visions for conceptualizing politics, political analyses, and the nature of democracy. During the 1980s, women's activism in a variety of social movements—the environmental, peace, animal liberation, and environmental justice movements—came together and a new form of activism emerged, ecofeminist political activism. By the 1990s, this political activism had given rise to a diversity of ecofeminisms:

liberal, Marxist, socialist, radical, cultural/spiritual, and social ecofeminisms.Catriona Sandilands (1999)argues that traditional understandings of democracy, the public sphere, political speech, and coalition-building fail to adequately address the need for an ecologically informed democratic politics— an “ecological democracy”. For her, ecofeminist political analysis is not “politics as usual”; it is a gendered, ecologically informed perspective that uses its understanding of the unjustified dominations of women, animals and nature to reconceive notions of the public sphere, democracy, citizenship, and free speech.“Ecofeminist philosophical ethics” (henceforth, “ecofeminist ethics”) is the sub-field of ecofeminist philosophy that has received the most scholarly attention.Ecofeminist ethics is a kind of feminist ethics. As such, it involves a twofold commitment to critique male bias in ethics wherever it occurs and to develop ethics that are not male-biased. As a feminist ethic, it also involves articulation of values (e.g., values of care, empathy, and friendship) often lost or underplayed in mainstream Western ethics. What makes its critiques of traditional ethical theories “ecofeminist” is that they focus on women-nature connections.There is not one definition of ecofeminist ethics. However, there are some themes that run through ecofeminist ethics. These themes are about the nature of ecofeminist ethics generally, not about any particular ecofeminist ethic.

The scholarship in feminist environmental philosophy is expanding in a variety of novel ways.Some theoretical perspectives within feminist environmental philosophy (not mentioned before in this essay) that are emerging are:

- ecofeminism as embodied materialism (Mellor 2005)
- ecofeminist phenomenology (Glazebrook 2008)
- ecofeminist pragmatism (Mary Jo Deegan and Christopher Podeschi 2001)
- ecofeminist process philosophy (Christ 2006)
- queer ecofeminism

6.5 Conclusion

As it matured, references to feminist environmental philosophy became what it is now—an umbrella term for a variety of different, sometimes incompatible, philosophical perspectives on interconnections among women of diverse races/ethnicities, socioeconomic statuses, and geographic locations, on the one hand, and nonhuman animals and nature, on the other.The major criticism of ecofeminism is that it is essentialist. The ascribed essentialism appears in two main areas. Firstly, Ecofeminism demonstrates an adherence to the strict dichotomy, among others, between men and women. Some ecofeminist critiques note that the dichotomy between women and men and nature and culture creates a dualism that is too stringent and focused on the differences of women and men. In this sense, ecofeminism too strongly correlates the social status of women with the social status of nature, rather than the non-essentialist view that women along with nature both have masculine and feminine qualities, and that just like feminine qualities have often been seen as less worthy, nature is

also seen as having lesser value than culture. Secondly, a divergent view regarding participation in oppressive structures. As opposed to radical and liberation-based feminist movements, mainstream feminism which is most tightly bound with hegemonic social status strives to promote equality within the existing social and political structure, such as making it possible for women to occupy positions of power in business, industry and politics, using direct involvement as the main tactic for achieving pay equity and influence. In contrast, many ecofeminists oppose active engagement in these areas, as these are the very structures that the movement intends to dismantle.

6.6 Summary

Ecofeminism is a movement that sees a connection between the exploitation and degradation of the natural world and the subordination and oppression of women. It emerged in the mid-1970s alongside second-wave feminism and the green movement. Ecofeminism brings together elements of the feminist and green movements, while at the same time offering a challenge to both.The concept of Ecofeminism gained prominence when Vandana Shiva and Maria Mies gave a concrete shape to the concept in their book titled Ecofeminism.Ecofeminism raised the issue of reductionist, mechanistic science and the attitude of mastery over and conquest of nature as an expression of capitalist patriarchy. Today the contest between an ecological and feminist world-view and a worldview shaped by capitalist patriarchy is more intense than ever.

Glossary:

Ecofeminism: Ecofeminism, also called ecological feminism, branch of feminism that examines the connections between women and nature. Its name was coined by French feminist Françoise d'Eaubonne in 1974. Ecofeminism uses the basic feminist tenets of equality between genders, a revaluing of non-patriarchal or nonlinear structures, and a view of the world that respects organic processes, holistic connections, and the merits of intuition and collaboration.

Eurocentric:focusing on European culture or history to the exclusion of a wider view of the world; implicitly regarding European culture as pre-eminent.

Commodified: turned into or treated as a mere commodity.

Chipko movement: The Chipko movement, or ChipkoAndolan, was a forest coklnservation movement in India. It began when in 1970 in Reni village of Chamoli district, Uttarakhand and went on to become a rallying point for many future environmental movements all over the world.

World Bank: The World Bank is an international financial institution that provides loans to countries for the purpose of pursuing capital projects. It comprises two institutions: the International Bank for Reconstruction and Development, and the International Development Association.

6.8 Self Assessment Questions

1. What is Ecofeminism?

2. What are Political and Ethical perspectives of Ecofeminism?
3. What is the relation between feminism and ecological conservation?
4. Write a note on the contemporary relevance of Ecofeminism.

6.9 Suggested Readings

i. Christ, Carol. P. (2006). Ecofeminism and Process Philosophy. *Feminist Theology , 14* (3), 289-310.

ii. Vakosh, Douglas., & Mickey, Sam. (2018). *Literature and Ecofeminism: Intersectional and International Voices.* London: Routledge.

iii. Glazebrook, Trish. (2004). Eco-Logic: An Erotic of Nature. In R. F. Bruce V. Foltz (Ed.), *Rethinking Nature: Essays in Environmental Philosophy.* Bloomington: Indiana University Press.

iv. Hawthorne, Susan. (2002). *Wild Politics: Feminism, Globalisation, Biodiversity.* Melbourne: Spinifex Press.

v. MacGregor, Sherilyn. (2006). *Beyond Mothering Earth: Ecological Citizenship and the Politics of Care.* Vancouver: University of British Columbia Press.

vi. Mies, Maria., & Shiva, Vandana. (1993). *Ecofeminism.* Halifax: Fernwood Publications.

vii. Deegan, Mary Jo., & Podeschi, Christopher. (2001). The Ecofeminist Pragmatism of Charlotte Perkins Gilman. *Environmental Ethics , 23* (1), 19-36.

viii. Merchant, Carolyn. (2005). *Radical Ecology.* London: Routledge.

ix. Sandilands, Catriona. (1999). *The Good-Natured Feminist: Ecofeminism and the Quest for Democracy.* Minneapolis: University of Minnesota Press.

x. Shiva, Vandana. (1988). *Staying Alive: Women, Ecology and Development.* London: Zed Books.

xi. Waren, Karen J. (2000). *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters.* Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers.

CC 1.5

Unit-7

Development and Democracy with special reference to Atul Kohli and Amartya Sen

Contents

7.1 Objectives

7.2 Introduction

7.3 Development: Meaning and Debate

7.4 When does Development occur?

7.5 What is a democracy?

7.6 Is a level of Development necessary for Democratization?

7.7 Can there be development without Democracy?

7.8 Conclusion

7.9 Self Assessment Questions

7.10 References

7.1 Objectives

The unit on Development and Democracy introduces the concepts with a discussion on modernization theory. It then briefly discusses Human Development and Sustainable Development. The discussion on democracy differentiates between direct and representative democracy and also between procedural and substantive democracy. The unit uses Atul Kohli's thesis of the autonomy of the political in third world societies to examine the relationship between stages of development and the democratic moment. Finally, the discussion concludes with a scrutiny of the efficacy of democracy in bringing development using Amartya Sen's idea of development as freedom.

7.2 Introduction

Development and democracy are contested categories as also buzzwords of contemporary politics. Governments all over the world display democratic credentials and development is a common agenda for those who make claims on power. Development is the future that political parties promise in their drive to get elected or to continue to rule. In this unit on development and democracy, we discuss the

two concepts and also the relationship between them with special reference to the scholarship of Atul Kohli and Amartya Sen. The unit attempts to examine the link between development stages and transition to democracy and why democratic governments are more likely to lead to development.

7.3 Development: Meaning and Debate :

In ordinary usage, development implies a new stage in a changing situation or a movement from one level to another, usually with some increase in size, number, or quality of some sort (Reddock 2000: 24). Development discourse as we understand it, originated in the post World War II period in the context of the cold war competition between the two power blocs. In its simplest terms, development described the stages through which newly independent postcolonial countries were to be transformed into modern developed nations (Reddock 2000: 24). The Third World or underdeveloped or developing countries or even the Global South, in colonial view were thought of as primitive and backward. The approach was underscored by the colonial feeling of superiority which was dismissive of the social, cultural, economic or political attributes of former colonies.

Development was then a linear path towards industrialization and urbanization, a process by which developing countries would come to resemble the West. Development theory emerged as economists theorized about the stages of development that third world societies would traverse. The concept of development in political science manifested itself as modernization theory. Modernization theory categorized societies based on production system, from primitive, backward and developed. The division of society into stages incorporated the notion of progress. Thus the process of political and social change in developing countries was measured against the benchmark of development and modernization represented by the West. In economic terms, the indicator was industrialization and urbanization and in political terms, it referred to the process of nation building from a backward society to a modern state characterized by rational political institutions (Reddock 2000: 26). The suggestion was that each society passes through the recognized stages from primitive societies to industrial societies as they modernize and progress (Reddock 2000: 39-41).

The approach suffers from ethnocentrism as they elevate the western experience and attributes of development and modernization as the definite and the only viable parameter. The dependency criticism to the developmental paradigm points to the contribution of colonial policies and neocolonialism, in the continued ‘backwardness’ of the colonies. Despite ignoring the vast differences that exist among the third world, development theory had an enormous impact on the political and economic conditions of the third world (Reddock 2000: 39-41).

7.4 When does Development occur?

Since development was equated with urbanization and industrialization, it was said to occur if the Gross National Product (GNP), a measure of the change in output and income per capita, was

increasing. Thus irrespective of the attributes or aspirations, countries were compared on the above indicators and ranked. If the GNP was increasing, a country is said to be developing. The countries, based on their rank, were divided into categories of developed and developing. There was also the phrase catching up, which referred to the closing gap between the increasing GNP of a developing country and that of a developed one (Griffiths et al 2002: 75).

There are problems associated with this measure of development. It is now considered common sense that the singular focus on economic growth is not an accurate indicator of the health of a region (Kurtz 2008: 2020). Moreover, the use of economic indices to measure development reinforces the notion that progress is related to production and consumption. The dramatic levels of productivity and consumption have lead to an unsustainable demand for resources. A small minority of the world consumes a majority of the world's resources and has led to the marginalization of the poor, globally and nationally, with an ever increasing rise in inequalities across the world. The first development decade of the 1960s reported that industrialization strategies had worsened the lives of the poor and women in third world countries (Reddock 2000: 34). The pressure to maintain the pace of growth has not only taken a toll on the environment but also created new risks like nuclear waste and accidents.

Another problem of the index of economic growth as development and one that is of interest to us in this unit is that, it is silent about political liberties and human rights of citizens. In fact, while development is equated to modernization and therefore democratic forms of government, the ambiguity in the discourse on the process of development, as well as the giant strides that China has taken, has led to beliefs that democracies are not conducive to development. But as Griffiths et al comment, "Can a country be said to be developing if its citizens are politically oppressed and (their) basic human rights denied? For example, the Chinese rush to industrialization in the 1950s and 60s was at the expense of the welfare of the population who suffered widespread famine and terrible living conditions, close to a few million Chinese died" (2002: 75).

Despite its narrow origins, today, the concept of development has significantly expanded. The first was the redefinition of development as human development and later as sustainable development. Human Development was the measure of development in terms of satisfying of basic needs thereby enlarging of people's choices needed for a dignified life. It incorporates needs like food, shelter, clean water, health care, access to education and other aspects that make up an acceptable standard of living for all in society. Sustainable Development on the other hand is a much larger elaboration and reinterpretation of the understanding of development. The idea of Sustainable Development came from the Brundtland Commission formed by the UN in 1983 that emphasized the integration of economic and ecological systems for sustainable development to be achieved (Griffiths 2002: 307). Sustainable Development was defined as 'that which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs' (Kurtz 2008: 2019). It draws together environmental, economic and social concerns: Integration of conservation and development; maintenance of ecological integrity; satisfaction of basic human needs (Reddeck 2000: 32).

The other change was the gradual entwinement of development and democracy. In fact, the expansion of the concept of development as human development, anticipated later discourses, that development cannot occur without the concomitant development in terms of political rights and liberties. Amartya Sen in Development as Freedom, brings together both the expanded idea of development and the crucial question of political liberties and human rights. Sen posits that development is an exercise to overcoming poverty as well as tyranny, defining development, 'as a process of expanding the real freedoms that people enjoy' (Sen 2001: 3-4). The narrower view of development identified as growth in GNP and income, according to Sen, can expand or contribute to freedoms but cannot stand in for substantive human freedoms or capabilities. We will come back to this discussion linking democracy and development in the later section after a discussion on democracy.

7.5 What is a democracy?

Democracy essentially suggests that political power rests in the hands of the people. The term is derived from the Greek d–mokrati, which was coined from d–mos ("people") and kratos ("rule"). We can define democracy as, 'a system of government characterized by regular elections, competitive political parties, universal franchise, secret balloting and respect for civil liberties and political rights' (Griffiths 2002: 66). But democracy can appear to be a vague concept when 'political systems as diverse as the USA, various one-party states in Africa and communist states all describe themselves as democracies' (Robertson 2002: 136). At bare minimum, a democracy is a state with periodic competitive elections and a body of citizens with equal rights. We can categorize democracies on the basis of their key features. The primary difference is between representative democracy (indirect democracy through elected representatives) and direct democracy (people decide policy directly). Further, we find many types of representative democracies among them liberal democracy, rule of law and protection of individual liberty and participatory democracy where there is greater citizen participation in decision making. Deliberative democracy on the other hand is a combination of representative and direct democracy.

Buhlmaan and Kriesi suggest that democracy can be conceptualized in various ways but we can collate them to a procedural (process-oriented, constitutional) democracy or a substantive democracy (Buhlmaan and Kriesi: 44). It incorporates both input and output orientation, distinguishes between them and is complementary. Procedural/electoral democracy is a minimalist one and refers to the regular elections, universal adult franchise and the presence of institutions, rule of law, separation of powers and varied associations and organizations. In the formal view of democracy, '...elected officials regularly face reelection or removal at the end of their term. The expectation is that the fear of removal will motivate representatives to act responsibly and respond to the public's desires' (Jacobs and Shapiro 1994: 11). Substantive democracy on the other hand is focused on 'the democratic substance of government activity between elections… on the nature or content of actual government action and

whether activity of government corresponds with the public's wishes' (Jacobs and Shapiro 1994: 11) or 'a process, which has to be continually reproduced, for maximising the opportunities for all individuals to shape their own lives and to participate in and influence debates about public decisions that affect them' (Kaldor 2008: 35).

Therefore, with the above categorizations of democracies, we can build a continuum of democracies based on the content of a political system from least democratic to those with most features of democracies. In the continuum, liberal democracies, which fulfill the following conditions, meaningful, extensive competition for positions of government power at regular intervals; inclusive political participation and civil and political liberties-freedom of expression, freedom of press, would likely feature as the most democratic (Griffiths 2002 :68).

The discourse on democracy generalizes many of the features associated with different kind of

democracies. Bernard Crick lays out four meanings attached to democracy (Crick 2002: 11). The first was democracy is rule of many or that the rulers have the consent of many. The second is good government is mixed government in the sense of good laws collectively made by the citizens. The third was that all citizens have the right to make their will in matters of public concern denoting the idea of general will or common good. Lastly, the fourth meaning was that all can participate but they must respect the equal rights of fellow citizens within a regulatory legal order that defines, protects and limits those rights signifying the idea of legally guaranteed individual rights.

Contemporary debates about democracy and development are hinged on the relationship between the two. There are two questions of fundamental importance. We will deal first with the relationship between level of development and the presence of democracy, a key concern of modernization theory. Subsequently, we will look at the debate of whether democracies are better or worse at delivering development. The answers to these questions will help us illuminate the relationship between the two concepts.

7.6 Is a level of Development necessary for Democratization?

Seymour Lipset in a seminal article in 1959 asserted that there is a broad, multistranded relationship between levels of economic development and democracy (1959). The article laid the ground for Modernization theory's generalization about the relationship between political system and levels of economic development. Lipset's argument based on cross national quantitative studies was that democracy is related to the state of economic development, that the better to do a nation-the greater chances that it will be a democracy (Huber et al 1993: 71). The indices of economic development or of modernization that Lipset utilized were per capita income/wealth (number of persons per motor vehicle or physicians and number of radios, telephones and newspapers per thousand persons), industrialization (percentage of agricultural to industrial works, per capital energy consumption), urbanization (cities) and education (Lipset 1959: 75-79). Modernization theory claimed that developing countries underwent a process of modernization, from their primitive and backward

stage, the ultimate aim of which would be democracy and it would be accompanied with socioeconomic modernization, simply put that development would lead to democracy. The key variables in the modernization process can be viewed as stages of development with democracy being the latter stage. The argument was that after some level of modernization, traditional forms of rule were difficult and new types of political institutions were needed to aggregate the demands of the increasingly complex society (Diamond 1992: 455).

The continuing work in the modernization tradition led to significant sharpening of Lipset's assertions of the link between development stage and democracy. Diamond in a reevaluation of Lipset's thesis on the relationship between socioeconomic development and democracy suggests a few conclusions that are relevant for our purposes. Development promotes democracy in two ways, where democracy exists; development contributes to its legitimacy and stability. In authoritarian societies, development leads to democracy but the emergence of the 'democratic moment'[1] depends on political institutions, leadership and choice. Second, it is not mere economic growth that is the most important developmental factor in promoting democracy, rather it is a cluster of social changes and improvements, in physical quality and dignity of people's lives, that it is the material dimensions of human development, broadly distributed among the population that is summarized as socioeconomic development that better predict the democracy than per capita income. Economic development provides a structural context in which human development occurs. Fourth, economic development facilitates democracy only if it alters the crucial intervening variables of political culture, class structure, state-society relations and civil society. Lastly, democracy can occur at low levels of development if the crucial mediating variables are present (Diamond 1992: 485-86).

The dependency theorists were the first to take issue with the modernization thesis. In their critique of modernization, dependency scholars disagreed with interpretations of the developmental problems of third world countries and also its methodological and ideological basis (Kohli 1986: 14-15). The third world was not in the early stages of development, as modernization states but rather, the third world was underdevelopment as a product of world economic conditions fostered by colonialism and neocolonialism. Dependency approaches recognized the difference of the third world countries from the industrializing west of the past and focused on the interaction of political, social and economic variables.

The other critique came from scholars of comparative historical traditions who questioned the results of modernization theory on the relation between development and democracy. Working with case studies of individual states in Central and South America, these scholars were skeptical about the chances of democracy as capitalist economic development spread around the globe (Huber et al 1993: 72). The central thesis is that capitalist development is related to democracy because it shifts the balance of class power, weakens dominating classes and strengthens working classes (Huber et al 1993: 74-76). They suggest that since class interests are historically constructed, they have crucial

[1]Democratic moment can be understood to mean the stage when a non-democratic polity transitions to a democracy in terms of its attributes.

consequences and that the economically dominant classes preferred democracy only if their interests were protected. They examined the resultant class conflict and found that it was not the bourgeoisie class (unlike in Europe) that pushed for democracy but that it was the organised working classes that were the vanguard of democracy and when the state and political parties could not contain them, economic elites turned towards the military to replace the democratic rule.

In the discussion with regard to the developmental trajectory of the third world, Atul Kohli finds that both the modernization and the dependency theorists reduce politics to its socio-economic variables (1986: 9-14). Kohli accepts the lasting contribution of modernization school especially in their analysis of political stability and disorder in developing countries (1986: 13). Dependency approaches were valuable for recognizing the different reality of third world countries from the past of industrializing western countries (1986: 15). According to Kohli, Modernization theorists collapsed the discussion between society and state, neglected the state and the variety of historical experiences of state building and ignored the impact of colonialism and neocolonialism (1986: 13). Dependency scholars meanwhile were proved to be wrong with their early assertion that the integration of a third world economy into the world capitalist economy produced underdevelopment (1986: 13). The empirical record of South Korea and Taiwan is that dependent development of a third world country was possible in the world capitalist economy.

So in contrast to modernization theory's assertion that a level of development was necessary for democracy, Kohli draws attention to the political economic reality in the third world, that socio economic change or 'development', itself was being generated and controlled by political authorities. The reality of politics and politicians controlling development is suggestive that respective government and their policies were responsible for industrialization drives and that the dynamics of development were molded by the developing states. Kohli terms this the autonomy of the political and it asserts itself in two ways. First, those who control state power are in a position to take decisions of far reaching socio-economic consequences-state actions are political choices. Secondly, autonomy is asserted due to the continuity of political traditions-that political cultures/structures do not alter readily, that patterns of regime formation, mode of political demands and its intensity are as much a product of the political past as the present (Kohli 1986:17-18).

The starting point for Kohli was that since their independence, third world states were committed to development, a 'teleological' orientation, that each of these states had an ultimate end, development and modernization, being as good as the other in the world system (1987: 25). But even if socio economic development was a legitimate political goal, the states did not have full control over their society's resources that would enable them to pursue their goal directly. Private property had a profound influence on defining the scope and limits of state intervention in society. The states relationship to productive property (which was mostly in private hands) was an important variable in understanding the nature and role of a state. Therefore, in non communist2 societies state autonomy was a state's capacity to restructure social relations and mobilize societal resources (1987: 27). Thus, Kohli characterizes non communist third world states as developmental capitalist states, development

being the state's goal and it was to be achieved by intervening in a growing capitalist economy with private ownership, thereby also bringing into focus, the varying capacity of states to mobilize and control social actors. The main agent of socio economic change within the third world, unlike Europe, was not the entrepreneur, rather it is the state.

In his subsequent work, The State and Poverty in India: The Politics of Reform, Kohli, underscores the point about the autonomy of the political in third world non communist societies through his study of the role and capacity of the state in India in reducing poverty. Kohli suggests that high growth rate or per capita income is not sufficient to bring about development, because the problem is not merely of growth but of 'reconciling growth with distribution' (1987: 1). This then is the fundamental issue which underscores the role and importance of political authorities in economic development of developing countries, for only conscious state intervention strategies by the state can result in successful redistribution. Avoiding both modernization and dependency perspectives, Kohli's alternative focus on the state's development role in capitalist third world countries suggests that the different patterns of socioeconomic development in countries involves both choice and restraint, therefore state intervention is an important variable for the study of political and social change (1987: 18-19). Kohli then goes onto identify the conditions likely to possess a degree of autonomy to facilitate economic gains for the poor. These conditions are coherent leadership; ideological & organizational commitment to be autonomous of propertied classes in governance, but pragmatic enough to not threaten them and make institutional penetration of society possible (Kohli 1987: 10). The regime attributes of keeping the propertied classes at bay while not threatening them facilitates a kind of autonomy that will create a degree of separation between political and social power and the autonomous political power will be utilized to manipulate state intervention in the interests of the poor.

7.7 Can there be development without Democracy?

In this section, we examine the debate about the relation between democracy and development that centers on the question of efficacy of regimes (democratic or undemocratic) in pursuing development. The interpretation is that development policies affect some voters adversely, so governments dependent on electoral support will avoid choices that impose hardship. This understanding permeates the notion that authoritarian countries are better at achieving developmental goals. But the empirical evidence in this regard is inconclusive. While some countries have achieved high growth rates under undemocratic regimes, improvement in standard of living have a positive impact on the rise of democracy. Przeworski et al found no direct relationship between regime type and growth of total income in countries using statistical analysis to find such correlations (Przeworski et alia 1991: 2000). Theoretically, scholars argue that democratic regimes are more conducive to stability and the predictability required for economic development. Democracy contributes to development through accountability, checks and balances, transparency and by giving people a voice to decide on their political leadership. When

[2]Communist states in contrast were in command of all the productive resources in society.

leaders fail to implement policies, people have the opportunity to reject ruling regimes and support other political forces that demonstrate greater commitment (Tommasoli 2013: 13). Pippa Norris finds that 'development goals are most often achieved under two conditions: first, where democratic institutions and procedures strengthen voice and accountability, providing opportunities for all citizens to express their demands and to hold elected officials to account for their actions, and, second, where the capacity of governance is strengthened so that the state can manage the supply of public goods and services' (Norris 2012).

The debate makes qualifications on two conceptual issues; the first is the difference between development in the broad sense and the narrow concept of economic growth. Secondly, others point out that in order to achieve economic growth among other conditions; a consolidated institutional framework, respect for the rule as well as transparent political institutions are the key components. This brings us to focusing attention on the substantive aspect of political life or the institutional arrangements instead of focusing solely on regime-type (Menocal 2007).

Amartya Sen offers the most expansive connections between democracy and development in his view of freedom as the primary end and the principal means of development (Sen 2001: xii). Sen believes that the removal of 'unfreedoms' is constitutive of development and that freedoms of particular kinds are necessary to promote freedom of other kinds. The argument builds on the linkages between different kinds of freedom and finds strong evidence to suggest that economic and political freedoms help reinforce each other and are not hostile to each other as is commonly perceived. The linkage can be further illustrated in terms of assessing social opportunities of education and health care in a society (Sen 2001: xii). Sen suggests that to access education and health care may require public action and so political freedom would help foster people's own initiatives in overcoming their deprivations. For Sen, liberty and rights, elements of substantive democracy, are constituent components of development and that freedom and rights are very effective in contributing to economic progress (Sen 2001: 3). Sen's point of departure from existing literature lies in the approach that identifies freedom as the main object of development and then establishes the role and interconnections between certain crucial instrumental freedoms including economic opportunity, political freedoms, social facilities, transparency guarantees and protective security. Each of these rights and opportunities advances the general capability of a person and are inter-related and complement each other in the following manner, political freedoms (free speech, elections) promote economic security, social opportunities (education/health care) facilitate economic participation, economic facilities (opportunity for participation in trade and exchange) then helps generate personal and public wealth. Sen reinforces these valuational priorities through empirical analysis. We can sum up this discussion with Sen's assertions that freedom is both a constituent of development in itself and not only the ends of development but also its principal means.

Development for Sen is enhanced by democracy as it plays an instrumental role in empowering people with the ability to shape values and norms, very similar to the Emerging principle (Tommasoli 2013: 14) of democratic ownership of development or the idea of sustainable development that is

owned by the community. The Sustainable development literature builds a model where development is pursued in the context of community, in accordance with its goals, interests and culture-a model that encourages democratic pluralism (pro people pro nature) (Kurtz 2008: 2019).

7.8 Conclusion :

In this unit we examined the concepts of development and democracy. We learn about the evolution of the concept of development and the crucial link between development and political rights as illustrated by Amartya Sen. We then discuss and differentiate between the two broad conceptions of democracy, procedural and substantive. Through our examination of the modernization debate, specifically, the link between development stage and democracy, we conclude with Atul Kohli's assertion of the autonomy of the state in the third world in ushering development. Finally, we examine the efficacy of democracy to bringing development and conclude with Amartya Sen's focus on the different kinds of freedoms.

7.9 Self Assessment Questions :

1) Explain the evolution of the concept of development.
2) Discuss various conceptions of democracy.
3) Evaluate the on-going debate on democracy and development.
4) Explain the concept of development and its relations with democracy.

7.10 Suggested Readings

i. Crick, Bernard. (2002). *Democracy: A Very Short Introduction.* Oxford : Oxford University Press.

ii. Kohli, Atul. (1986). *The State and Development in the Third World: A World Politics Reader.* New York: Princeton University Press.

iii. Kohli, Atul. (1987). *The State and Poverty in India: The Politics of Reform.* Cambridge: Cambridge University Press.

iv. Lipset, Martin Seymour. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *The American Political Science Review , 53* (1), 69-105.

v. Griffiths, Martin., O'Callaghan, Terry., & Roach, Steven C. (2002). *International Relations: The Key Concepts.* New York: Routledge.

vi. Robertson, David. (2002). *The Routledge Dictionary of Politics.* London: Routledge.

vii. Sen, Amartya. (2001). *Development as Freedom.* Oxford: Oxford University Press.

পাঠক্রম : ১.৫

Unit-8

Subaltern Studies with special reference to Spivak and Ranajit Guha

গঠন :

৮.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৮.২ ভূমিকা

৮.৩ সাব-অলটার্ন চর্চার উৎস এবং বর্তমান প্রেক্ষিত

৮.৪ রণজিৎ গুহ এবং সাব-অলর্টান চর্চা

৮.৫ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এবং সাব-অলটার্ন চর্চা

৮.৬ উপসংহার

৮.৭ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৮.৮ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটিতে যে বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলি হল—

ক) সাব-অলটার্ন চর্চার উত্থান ও তার বর্তমান প্রেক্ষিত, ও সেই সূত্রে রনজিত গুহ-র দৃষ্টিভঙ্গি

খ) গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক-এর "Can the Subaltern Speak?" কে কেন্দ্র করে তাঁর সাব-অলটার্ন চর্চা।

৮.২ ভূমিকা

সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ ১৯৮২ সালে '*Subaltern studies : Writings on Indian History and Society*' একটি সিরিজ হিসেবে যাত্রা শুরু করে, যা তৎকালীন আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিতর্কের সূত্রপাত করেছিল। বিখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক তথা ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স এর অধ্যাপক রণজিৎ গুহ (জন্ম ১৯২৩) এই চর্চার পিছনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত রণজিৎ গুহ এবং ভারত, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্যে অবস্থানকারী আটজন তরুণ অধ্যাপক subaltern studies বা নিম্নবর্গের ইতিহাসকে সম্মিলিতভাবে সম্পাদনা করেন। ১৯৮৮ সালে গুহ এই দলটি থেকে অবস নেন। বর্তমানে এই সিরিজটির একটি বিশ্বজনীন উপস্থিত রয়েছে, যা 'Academic Specialization! হিসেবে

ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ার সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর পরিসরে পদার্পণ করেছে। বুদ্ধিজীবি মহলেও নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা কেবলমাত্র ইতিহাসে চর্চা একটি শাখা হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রের উত্তর ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকরা এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সমাজ বিজ্ঞান পন্ডিত এবং ইতিহাস জাতীয়তাবাদ, প্রাচ্যবাদ এবং ইউরোসেন্ট্রিসম-এর সমালোচকরা এই নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। একইসঙ্গে সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাস সংক্রান্ত নানা পত্রপত্রিকায় নিম্নবর্গের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এই সিরিজটি থেকে নির্বাচিত বহু অংশ ইংরেজি, স্প্যানিশ, বাংলা এবং হিন্দিতে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে উত্তর-আমেরিকায় একটি ল্যাটিন আমেরিকান সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ, ২০১২ সালে নাগদ সাব-অল্টার্ন গোষ্ঠীর প্রকাশনা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে 'সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ' আর প্রকাশিত হবে না। দীর্ঘ তিন দশক ধরে গবেষণার পর প্রধান তাত্ত্বিকরা মনে করছেন যে গোষ্ঠীর কর্মকান্ড বন্ধ করে দেওয়া উচিত। সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের খন্ডগুলির মধ্যে প্রায় ৪৪ জন লেখকের ২০০টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে, এগুলির মধ্যে বেশ কিছু বিভিন্ন ভাষায় অনুদিতও হয়েছে। সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এর গবেষকরা প্রত্যেক বর্তমানে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করছে। তবে, বর্তমানেও নিম্নবর্গ সংক্রান্ত যে কোনও গবেষণায় এই সাব-অল্টার্ন গোষ্ঠীর আটজন প্রতিষ্ঠাতা এবং রণজিৎ গুহর 'বুদ্ধিজীবী শক্তি' দৃশ্যমান।

৮.৩ সাব-অলটার্ন চর্চর উৎস এবং বর্তমান প্রেক্ষিত

সাব-অল্টার্ন শব্দটির বাংলা পরিভাষা হল নিম্নবর্গ। subaltern studies গোষ্ঠীর প্রধান উদোক্তা রণজিৎ গুহ সর্বপ্রথম 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ইংরেজি subaltern শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ প্রথম প্রকাশ পায়। ১৯৮৩ সাল নাগাদ প্রথম সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের গবেষণার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন এবং এই চর্চার প্রথম সংকলনে যাদের লেখা ছাপা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র রণজিৎ গুহ বাদে অন্য সকলেই ছিলেন তরুণ এং বিশ্বের কাছে অপরিচিত লেখক। ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যে নতুন দুটি বিষয় সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ উপস্থাপন করে, তাহল (১) ঔপনিবেশিক ভারতে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের স্বাতন্ত্র্য; (২) কৃষক চৈতন্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এই দুটি বিষয় সবচেয়ে বিশদে তথ্যের সহিত আলোচনা করা হয় রণজিৎ গুহর গ্রন্থটিতে। সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের নিজস্ব সংকলন ছাড়াও প্রকাশিত হয় সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ গোষ্ঠীর লেখকদের নিজস্ব গবেষণা গ্রন্থ, যেমন—ডেভিড হার্ডম্যান এর ''পেজান্ট ন্যাশনালিস্ট অফ গুজরাট'' (১৯৮১), শাহিদ আমিন এর 'সুগারকেন এন্ড সুগার ইন গোরক্ষপুর'' (১৯৮৪), পার্থ চ্যাটার্জির ''বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭: দি ল্যান্ড কোয়েশ্চেন'' (১৯৮৪) ইত্যাদি। তবে, সাব-অল্টার্ন চর্চার ইতিহাস আলোচনার পূর্বে এই শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত জরুরি।

ইংরেজি ভাষায় শব্দটিকে সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের সাব-অল্টার্ন বলা হয়ে থাকে। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। সাব-অল্টার্ন গোষ্ঠীর অন্যতম বিখ্যাত লেখক ডেভিড আর্নল্ড এর মতানুসারে, 'এলিট শ্রেণীর জমিদারের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে ধনী কৃষক নিম্নবর্গ আবার আধিপত্যের দিক থেকে এই ধনী কৃষক গ্রামীণ দরিদ্র ভূমিহীন মজুর, কারিগর ও অন্ত্যজ শ্রেণীর তুলনায় উচ্চবর্গ। তবে সাব-অল্টার্ন বা নিম্নবর্গ ধারণাটি সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ গোষ্ঠীর লেখকরা আন্তোনিও গ্রামশির *selections from the Prison Notebooks* গ্রন্থটি থেকে গ্রহণ করেছেন। সাব-অল্টার্নের সমার্থক শব্দ হল 'সাবর্ডিনেট'। মুসোলিনির কারাগারের রাজনৈতিক বন্দি নব্য মার্কসবাদী গ্রামশির রচনায় শব্দটির নতুন অর্থের উদ্ভব ঘটে। আন্তোনিও গ্রামশির ''কারাগারের নোটবইয়ের'' Notes on

Italian History অধ্যায়ের History of the subaltern classes : Methodological criteria অংশে বর্ণিত ছয়টি দিক নির্দেশে নিম্নবর্গ শ্রেণীর জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ভাবাদর্শ গভীরভাবে পাঠ করার যে প্রয়োজনীয়তা কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার সঙ্গে সংলগ্নতার কথা বলেছেন রণজিৎ গুহ। সুতরাং গ্রামশিকে সাব-অল্টার্ন তত্ত্বের ভ্রূণ বলা যেতে পারে। গ্রামশি তার কারাগারের নোটবই গ্রন্থে ফ্যাসিবাদী মুসোলিনীর তীক্ষ্ণ নজর থেকে বাঁচার জন্য রূপকের সাহায্যে মার্ক্সবাদের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে তার নিজস্ব বিশ্লেষণ হাজির করেছিলেন। মার্ক্সবাদী আলোচনার দুটি প্রাথমিক পরিভাষা—পুঁজিমালিক বা বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণী বা প্রলেতারিয়েত এর রূপক হিসেবে যথাক্রমে হেজিমনিক এবং সাব-অল্টার্ন নামক দুটি শব্দকে গ্রামশি ব্যবহার করেছেন। মার্ক্সীয় দর্শনের পরিভাষা হিসেবে তিনি প্রাক্সিসের দর্শনকে ব্যবহার করেছেন। অর্থনীতি নির্ভর পুঁজিবাদী সমাজে মালিকশ্রেণীই ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করে। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশ্রেণী সাব-অল্টার্ন। তবে, গ্রামশির লেখায়, ইতালির অসম্পূর্ণ পুঁজিবাদী বিকাশ পর্বে সামন্ত শ্রেণী এবং কৃষক শ্রেণীই অধিক গুরুত্ব পেয়েছেন। তিনি তার বিশ্লেষণের দ্বারা দেখিয়েছেন, শাসক এবং শোষিতের সম্পর্ক চিরকালই বিরোধপূর্ণ। গ্রামশির ধারণায়, সাব-অল্টার্ন শ্রেণীর বিপরীতে অবস্থিত হেজিমনিক শ্রেণী দ্বারাই শোষিত ও শাসিত হয় সাব-অল্টার্ন শ্রেণী। তা সত্ত্বেও গ্রামশি দেখিয়েছেন যে যখনই প্রতিবাদে গর্জে ওঠে সাব-অল্টার্ন শ্রেণী, তখনই বিপদ ঘনিয়ে আসে হেজিমনিক বা প্রভুত্বকারী শ্রেণীর। কিন্তু বিদ্রোহে সামিল হলেও কৃষক চেতনা আচ্ছন্ন থাকে শাসক শ্রেণীর মতাদর্শের আবরণে। তাই তাদের বিদ্রোহ শাসক শ্রেণীর কাছে পরাজিত হয়। গ্রামশি দেখালেন কৃষক চেতনা সীমাবদ্ধ, তাই তাদের বারংবার পরাজয়ের শিকার হতে হয়। এভাবেই গ্রামশির লেখনীর দ্বারা সাব-অল্টার্ন চেতনার এক সম্ভবনাময় দিকের উত্থান ঘটে। তাই বলা যায়, গ্রামশিকে কেন্দ্র করেই সাব-অল্টার্ন বা নিম্নবর্গ চর্চার যাত্রা শুরু হয়।

১৯৭০-এর দশককে ভারতের মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে বাদানুবাদের সূত্রপাত হয়, সেই অসম্পূর্ণ বিতর্কে সাব-অল্টার্ন চর্চার শিকড় খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতের বামপন্থী রাজনীতির একটি বিখ্যাত বিতর্ক ছিল ১৯৭৬ সালে নকশালবাড়ী কৃষক সংগ্রাম ও আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনা। ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে এই রাজনৈতিক সংগ্রাম শেষ হলেও তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলন শেষ হওয়ায় পরেও দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষের সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এই আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই 'নকশাল আন্দোলন' নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। এই আন্দোলন 'স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিন্যাসের প্রশ্নটি জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে এমনই নাটকীয়ভাবে উপস্থিত করতে পেরেছিল যে সেই প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করা ছিল অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস নিয়ে এই সব অসম্পূর্ণ পটভূমিতে ওই ক্ষমতা বিন্যাসের প্রশ্নটিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ গোষ্ঠী। বিংশ শতকের শেষদিকে এদেশে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাব-অল্টার্ন চর্চার সূত্রপাত হয়। সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ গোষ্ঠীর প্রধান উদ্যোক্তা রণজিৎ গুহ সর্বপ্রথম 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ইংরেজি Subaltern শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় গ্রহণ করেন। নব্বইয়ের দশক ব্যাপী তাঁর সম্পাদিত ছয় খণ্ড Subaltern Studies (1982-1989) সিরিজ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চার জগতে আধিপত্য বিস্তার করে। রণজিৎ গুহ সহ সাব-অল্টার্ন গোষ্ঠীর গবেষকরা ইতিহাস তত্ত্বের দিক থেকে ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক এবং কৃষক বিদ্রোহকে 'history from below' এর নীতিতে পুনরায় মূল্যায়ন করেছেন।

রণজিৎ গুহ অধীনতাকে বোঝার জন্য গ্রামশির ন্যায় আধিপত্য-অধীনতা এর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। কারণ সাব-অল্টার্ন সর্বদাই শাসক গোষ্ঠীর অধীনে থাকে এমনকি বিদ্রোহ ও জেগে ওঠার মুহূর্তেও তারা শাসকবর্গের মতাদর্শ ও কমকান্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। গুহ দ্বারা ব্যবহৃত দুটি শব্দ dominance ও subordination এর অর্থ হল যথাক্রম আধিপত্য ও অধীনতা। আধিপত্য বলতে মূলত অভিজাত বা উচ্চবর্গের প্রভুত্বকে বোঝায় বা প্রতাপ বা শাসনকে বোঝায় অপরদিকে অধীনতা নিম্নবর্গের শাসিত হবার রূপটি উন্মেচিত করে। গ্রামশি তার কারাগারের নোটবইতে একাধিক বার dominant

classes, dominant groups, hegemony শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। এই শব্দগুলির বিপরীতেই অবস্থান করে সাব-অল্টার্ন গোষ্ঠী। প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন বা প্রতাপের বিপরীতে অবস্থান করে অধীন, দলিত, শোষিত, নিপীড়িত নামক শব্দগুলি। সুতরাং শ্রেণী, জাতিবর্ণ, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ও পেশাগত অবস্থানের দিক থেকে এবং শিক্ষায়, অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিক মর্যাদায় অনগ্রসর, অনুন্নত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিম্নবর্গ বা সাব-অল্টার্ন বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষের সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সামাজিক সম্পদের উৎপাদন এবং বণ্টন এর ভিত্তিতে এই শ্রেণীকে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে ভাগ করা যায়। শ্রেণীর সম্পর্কিত ধারণাটি অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে, সামন্ত সমাজে ভূস্বামী ও ভূমিদাস এবং বুর্জোয়া সমাজে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতর কথা বলা যায়। অন্যদিকে নিম্নবর্গের অর্থনীতির সঙ্গে ইতিহাস এবং সংস্কৃতির যোগাযোগের সম্পর্কটিও সাব-অল্টার্ন চর্চার গবেষণার অন্তর্গত। সুতরাং শুধুমাত্র অর্থনীতির ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাজন নয়; নিম্নবর্গ উচ্চবর্গ প্রত্যয় ক্ষমতার সম্পর্কের সঙ্গেও সাব-অল্টার্ন চর্চা জড়িত। যেমন ক্ষেতমজুর হিসেবে স্বামী-স্ত্রী একই শ্রেণীর অন্তর্গত কিন্তু পরিবারে আধিপত্যের দিক থেকে স্বামী উচ্চবর্গের স্ত্রী নিম্নবর্গের হিসেবে বিবেচিত হয়। একইভাবে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধিপত্যের দিক থেকে শিক্ষক উচ্চবর্গ ছাত্র নিম্নবর্গ। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক অর্থে ক্ষমতার সম্পর্ক দিয়ে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ বিচার করতে হবে। অর্থাৎ 'নিম্নবর্গ' একটি সম্পর্কের নাম।

১৯৭৪-৭৫ সাল নাগাদ কলকাতার একদল তরুণ গবেষক (সুমেন্দু দাশগুপ্ত, পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং গৌতম ভদ্র প্রমুখ) মিলে একটা পত্রিকা প্রকাশ করেন, যার নাম ছিল 'অন্যঅর্থ'। গৌতম ভদ্র এই পত্রিকায় 'মুঘল যুগের কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ'-এর প্রথম খসড়াটা দেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বুর্জোয়া পলিটিক্সের রাজনৈতিক তত্ত্বের একটা লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল বিদেশে থাকলেও রণজিৎ গুহ দেশের ভাষায় প্রকাশিত লেখার খবর রাখতেন। 'অন্যঅর্থ' প্রসঙ্গে তাঁর আগ্রহ ছিল। ইতিমধ্যে ফ্রন্টিয়ারে তাঁর দুটো খুব বিখ্যাত লেখা বের হয়। '*On structure, on culture, Neel-Darpon: The image of a Peasant Revolt in a Liberal Mirrow*'। রণজিৎ গুহ 'সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ' তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে ভারতে আসেন। এবং এ বিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্রের সাথে কথা বলেন। দেশজ অনুসন্ধান আর বিদেশি গবেষণা—এ দুইয়ের সমন্বয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসের ধারা রচিত হয়েছে। এই তরুণ গবেষকগণ এবং রণজিৎ গুহর মধ্যে প্রায় তিরিশ বছরের পার্থক্য ছিল। রণজিৎ গুহ তিনটি প্রজন্মকে ডিঙিয়ে তরুণ গবেষকদের নিয়ে 'সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ' প্রকল্প তৈরি করেন। পরবর্তীকালে অল্প কিছুদিনের জন্য সুমিত সরকার এই গোষ্ঠীতে যোগ দেন।

তিনটে আধুনিক আন্দোলন নিম্নবর্গের ইতিহাসের তত্ত্বকে, ক্ষমতার সম্পর্কের সহজ সরল সমীকরণকে প্রশ্নবিদ্ধ ও অনেক বেশি জটিল করেছে।

প্রথমত, পরিবেশবাদী বিতর্ক। পরিবেশবাদীরা ধনতন্ত্রবাদকে আক্রমণ করেছে, গোটা পরিবেশের প্রশ্নটি তুলে বিজ্ঞানের প্রগতির প্রশ্নকে চ্যালেঞ্জ করেছে। আজকের বিশ্বায়নের বিতর্ক, সাম্রাজবাদী পরিবেশের প্রকল্প, বিশ্বজুড়ে ভারতে তো বটেই, পাহাড়, স্থল, মাইন ইত্যাদি নিয়ে বহুজাতিক সমস্যা, সরকারি-বেসরকারি লাভ-ক্ষতি, ম্যান্টিন্যাশনাল কোম্পানির লোভ, সমস্ত জনসত্তার অস্তিত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ২০১৩ সালে ভারতের উত্তরাখণ্ডের বিশাল বন্যা, ঝড়, সারা উত্তরাখণ্ডে Tourism Industry-র লোভ ইত্যাদি দিয়ে হাজার হাজার মানুষের বেঁচে থাকাটা শারীরিকভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। আমরা জানি ব্রাজিলের আমাজনের বন কেটে ফেলার ফলে ব্রাজিলের জনগণ কিভাবে রাস্তায় নেমে এসেছিল। এখন Human Species হিসেবে থাকাট সংকটজনক। এখানে বৈজ্ঞানিকরা বলতে শুরু করেছেন আসলে সমস্যাটা অনেক বড়ো। তত্ত্বের সমস্যা ও সময়ের সমস্যা। যদি আমরা মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে বড়োভাবে দেখি পৃথিবীর বিবর্তনের সঙ্গে, প্রাণের জন্মের সঙ্গে, তাহলে দেখব Industrial Revolution-এর সময় থেকে Geologist-রা বলছে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। প্রগতি মানে প্রযুক্তির জয়। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করবে আগুন থেকে তেল, জ্বালানি সমস্ত নিয়ে। এই প্রযুক্তির জয় যেটা মার্কসবাদের আছে

কমপ্লিট প্রডাক্টিভিটি ফোর্স তা সারা প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে। প্রকৃতি ও মানুষকে ধ্বংস করছে। সেদিক থেকে শিল্পবিপ্লব প্রথম ধ্বংসের ঘণ্টা বাজিয়েছে। অন্যদিকে ইতিহাস থেকে আমরা জানি ক্যাপিটালিজমের বিজয়বার্তা হচ্ছে Industrial Revolution। আধুনিক মানুষের জন্মের পিছনে Industrial Revolution-এর বিখ্যাত ভূমিকা। ইতিহাসের চিন্তায় যেটা প্রগতির Geologist-এর চিন্তায় সেটা ধ্বংসের। Geologist-এর কালের সময়ের ধারণার সঙ্গে ইতিহাসের সময়ের সংঘর্ষ অনিবার্য। সাম্প্রতিককালে দীপেশ চক্রবর্তীর সাড়া জাগানো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে. ফলে সাব-অল্টার্নিটির প্রশ্নটাই নতুন করে ভারতে হচ্ছে। স্পষ্টত পরিবেশের সঙ্গে ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর বেঁচে থাকার অধিকার জড়িত। এখানে নিম্নবর্গের অস্তিত্ব আবার গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে নতুন মাত্রা পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ফেমিস্টি বা নারীবাদী বিতর্ক। অর্থাৎ জেন্ডার বা লিঙ্গ বা লৈঙ্গিক রাজনীতি বিতর্ক। এক্ষেত্রে সমকামী, উভকামীরাও এগিয়ে এসেছে। সেখানে সাব-অল্টার্নিটির ভূমিকা কী? এটাও ঠিক Patriarchal নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে পুরুষতন্ত্র দিয়ে। আবার এটাও তো ঠিক পুরুষতন্ত্রের পুরুষ যতটা নিষ্পেষণ করে নিজেও ততটাই নিষ্পেষিত হয়। পুরুষতন্ত্রের অত্যাচারী পুরুষ নিজেও তো মুক্ত মানুষ নয়। নারীর মুক্তি তো কখনই সম্ভব নয়, যদি পুরুষের মুক্তি না হয়। ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রকৃতি লৈঙ্গিক রাজনীতির লড়াইয়ের প্রকৃতি সমশর্তে প্রকৃতস্থ নয়। সেখানে সাব-অল্টার্নিটির ভূমিকা কী, সেটাই ভাবার প্রশ্ন।

তৃতীয়ত, ভারত-বাংলাদেশের অনেক দলিত তাদের কথা লেখার ভাষায় বলছে। আশীষ নন্দীর কাজ লক্ষ্য করলে তার প্রমাণ মেলে। দলিতদের রাজনীতি আজকে খুবই বিতর্কিত। দলিতদের রাজনীতি কি দুর্নীতিগ্রস্ত? দলিতদের গোষ্ঠী হিসেবে উত্থান, দলিতদের চেতনার স্বরূপ কী? তারা ব্রাহ্মণদের লেখা পড়তে অস্বীকার করেছে আজ ভারতজুড়ে দলিতদের দাবি—বাংলা হঠাও, হিন্দি হঠাও, ইংরেজি আনো। এই যে আঞ্চলিক ভাষায় লেখাপড়া, এতে দলিতদের আগ্রহ নেই। তাদের মতে এটা উচ্চবর্গের একটা চাল। নিজেরা অর্থাৎ উচ্চবর্গের সন্তানেরা ইংরেজি শিখবে এবং দলিতদের আঞ্চলিক ক্ষমতায় ফেলে রাখবে। আজকে সর্বভারতীয় স্থান পেতে হলে আম্বেদকরের মতো ইংরেজি শিখতে হবে। দলিত গ্রামে ইংরেজি দেবীর পূজা শুরু হয়েছে। সারা ভারতে দলিতকে এক্কাট্টা হতে গেলে ইংরেজি ভাষা ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই।

উচ্চবর্গ থেকে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য এবং নিম্নবর্গের চেতনার নিজস্বতা অন্বেষণই সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের প্রাথমিক কাজ ছিল। এছাড়া এ গোষ্ঠী নিম্নবর্গের ইতিহাস নির্মাণে নিম্ন লিখিত কাজ করেছে—

(ক) ঔপনিবেশিক ভারতের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা এবং আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠান গড়ার জটিল ইতিহাসের দলিলসমূহ অন্য দৃষ্টিতে পাঠ।

(খ) ব্রিটিশ শাসন যন্ত্রের প্রসার, ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, নবজাগরণের উদ্ভব, সর্বোপরি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ প্রভৃতির ইতিহাস অন্বেষণ ও পুনর্বিবেচনা।

(গ) কেবল নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপের বিবরণে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র সমাজ প্রতিষ্ঠান, ভাবাদর্শের জগতকেই নিম্নবর্গের দৃষ্টিতে দেখা। ঔপনিবেশিক আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রে ও স্বাধীন ভারতে যেসব প্রতিষ্ঠান নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল সেসব প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে, স্কুল-কলেজ, সংবাদপত্র, প্রকাশনা সংস্থা, হাসপাতাল ডাক্তার, চিকিৎসাব্যবস্থা, জনসংখ্যাগণনা, রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, আধুনিক শিল্প উৎপাদনে দৈনন্দিন শ্রম সংগঠন, বিজ্ঞান সংস্থা, গবেষণাগার প্রভৃতির বিশদ ইতিহাস অন্বেষণ।

(ঘ) প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা। অর্থাৎ যেকোনও প্রতিষ্ঠিত অভিলাষী ক্ষমতাতন্ত্রের সমালোচনা এই গোষ্ঠীর আলোচনায় সম্ভব হল।

(ঙ) প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদ ও বামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীদের পারস্পরিক বিতর্কে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত।

(চ) আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অঙ্গীভূত এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা বিস্তারের কৌশলে সেক্যুলার/কমিউনাল বিবাদ/বিতর্ক এবং শোষিত, দরিদ্র হলেই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ও সেক্যুলার রাজনীতির সমর্থন হবে—এ ধারণার ভুল ভেঙে দিয়ে আলোচনা।

(ছ) জাতিভেদ প্রথা বিশ্লেষণে এ গোষ্ঠী দেখিয়েছে কিভাবে ধর্মীয় ভিত্তি লুপ্ত হয়ে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবস্থান গুরুত্ব পাচ্ছে। নিম্নবর্গ সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্নভাবে এই ক্ষমতাতন্ত্রের একদিকে বিরোধিতা করছে অন্যদিকে আবার সুযোগ নিচ্ছে। উচ্চবর্গের আধিপত্য বিস্তারের কৌশল এই জাতিগত পরিচয়ে নিহিত।

(জ) পুরুষ চালিত সমাজে নারী নিম্নবর্গ। এ সমাজে নারীর অধীনতা বা ক্ষমতার সম্পর্কের ভিত্তিতে নারীর নির্মাণ এবং নিম্নবর্গের নারীর অধীনতাকে পৃথক করে চিহ্নিতকরণ।

(ঝ) ভারতের রাষ্ট্র যন্ত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিংশ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে চর্চিত উচ্চবর্গের রাজনীতির বিরোধিতা করা।

বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে সাব-অল্টার্ন ইতিহাস চর্চা চলছে। দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার মতন সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের চর্চা চলছে। ভারতবর্ষেও সমাজ ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতকে নতুনভাবে সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের গবেষকরা উপস্থাপন করছেন। ভারতীয় সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের ঐতিহাসিকরা ভারতের কলোনির ইতিহাসকে সমাজের নিচু স্তর থেকে আলোচনা করেছেন। ল্যাটিন আমেরিকাতে সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে। সেখানে সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। জাপানেও বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় বেশিরভাগ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় ইউরোপ-অস্টেলিয়াতে এ গোষ্ঠীর লেখকদের নাম প্রায়ই উচ্চারিত হয়ে থাকে। মূলত দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসতত্ত্ব বিশ্বজয় করেছে 'সার্ব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ' প্রকাশনার মধ্য দিয়ে।

৮.৪ রণজিৎ গুহ এবং সাব-অলটার্ন চর্চা :

প্রখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদ এবং সাব-অল্টার্ন চর্চার দিশারি রণজিৎ গুহ ১৯২৩ সালের ২৩শে মে বরিশালের বাখরগঞ্জের সিদ্ধকাটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। গুহ পূর্ব বাংলার এক বনেদি জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এই উচ্চবর্গে জন্মানোর গ্লানিই তার জীবনের নতুন অধ্যায় রচনা করে। তিনি পড়াশোনার সূত্রে কলকাতায় চলে আসেন, এবং সেখানে বামপন্থী রাজনীতির ছত্রছায়ায় পালিত হতে থাকেন। তিনি সিপিআই-এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গুহ ১৯৪৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসেবে এবং ইউরোপে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপে বিশ্ব ছাত্র সম্মেলনে যোগ দান করেন। পরবর্তীকালে তিনি দলের প্রতিনিধি হিসেবে সাইবেরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও চিনে কমিউনিস্ট বিপ্লব স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পান। ১৯৫৩ সালে রণজিৎ গুহ ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এদেশে শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

রণজিৎ গুহ বিদ্যাসাগর কলেজে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন। তিনি সাসেক্স ইউনিভার্সিটির রিডার রূপে নিযুক্ত হন। রণজিৎ গুহ কৃষক বিদ্রোহ অধ্যয়নের

ক্ষেত্রে পদ্ধতি হিসেবে 'subaltern historiography'-কে ব্যবহার করেন। ১৯৫৪ সালে রমেশ চন্দ্র মজুমদার এবং নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ দ্বারা সম্পাদিত ইতিহাস পত্রিকায় রণজিৎ গুহর প্রথম ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ 'মেদিনীপুরের লবণশিল্প' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি গরিব মলাঙ্গিদের চরম দুর্দশা ও বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করেন। রণজিৎ গুহর রচনাগুলির মধ্যে *Rule of Property for Bengal: An Essay on the Idea of the Permanent Settlement* ((১৯৬৩) এবং *Elementary Aspects of Insurgency in Colonial India* (১৯৮৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত নিম্নবর্গ চর্চা এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক চর্চার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের নাম রণজিৎ গুহ। এছাড়া তিনি সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের প্রতিষ্ঠাত সম্পাদক। ১৯৭০ সালে তিনি বৈপ্লবিক ইতিহাস চর্চার জন্য কিছু সসমনোভাবাপন্ন ছাত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি দল গড়ে তোলেন, যা

সাম্প্রতিক দশকগুলোয় রণজিৎ গুহকে তার জ্ঞানচর্চার গতিপথে দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। যার একটি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। অপরটিতে তিনি একজন সফল বুদ্ধিজীবী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। রণজিৎ গুহর বুদ্ধিজীবী হিসেবে বৈপ্লবিক ইতিহাস চর্চা মূলত 'history from below' বা নিম্নতলের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। তিনি ইংল্যান্ডে ক্রিস্টোফার হিল, জর্জ রুড, ই. পি. থম্পসন, এরিক হবসবম এর মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। এখানে তিন এক প্রকারের আন্দোলন উপলব্ধি করেন, যা কৃষক এবং শ্রমিকদের মতো খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়ে চর্চা করতে আহ্বান জানায়। এরা মার্কসবাদের কিছু প্রভাবশালী তত্ত্বকে হাতিয়ার করে নিপীড়িত ও শোষিত মানুষদের প্রতিরোধের অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত যুক্তি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। রণজিৎ গুহ ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামশির কাজ থেকে গভীরতর প্রভাবিত হন, যিনি ১৯৩০-এর দশকে ফ্যাসিবাদী কারাগারে একজন রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন। সাব-অল্টার্ন চর্চায় রণজিৎ গুহ এবং সাবেক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের গবেষকদের উপর গ্রামশির প্রভাব বোঝার জন্য, ভারতের মতো একটি দেশে কৃষকদের বিশাল উপস্থিতি লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রণজিৎ গুহর মতো কিছু প্রভাবশালী মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা শিল্প শ্রমিকদের মতো নিপীড়িত মানুষদের নেতৃত্বে একটি ভবিষ্যৎ বিপ্লবের স্বার্থে সংগ্রাম করেন। গ্রামশি যে সময়কালে ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন সেখানে কৃষক সমাজের অবস্থান ছিল। গ্রামশি তার লেখায় শুধুমাত্র শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের উপর গুরুত্ব দানের জন্য কার্ল মার্কসের সমালোচনা করেন। ইতালির অসম্পূর্ণ পুঁজিবাদের বিকাশ পর্বে প্রভুত্বের অধীন কৃষক শ্রেণী গ্রামশির লেখায় অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ১৯৭০ সাল থেকে রণজিৎ গুহ এবং তার ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী মহল ক্রমবর্ধমানভাবে ভারতে মার্কসবাদী এবং বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক চর্চার সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করেছিলেন, যা দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রে কৃষক বিদ্রোহের গতিশীলতা এবং স্থানীয় আধিপত্যকে অগ্রাহ্য করেছিল। ১৯৭০-৭১ সাল নাগদ রণজিৎ গুহ গবেষণার কাজে ভারতে ছিলেন। এই সময় তিনি বেশ কিছু তরুণ মাওবাদী নেতার সংস্পর্শে আসেন, যাদের মতাদর্শ তার উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। একজন ঐতিহাসিক হিসেবে এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাকে কৃষকদের অবস্থা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। কৃষি দীর্ঘকাল ধরেই গুহর আগ্রহের বিষয় ছিল এবং তার প্রথম গ্রন্থ *Rule of Property for Bengal : An Essay on the Idea of the Permanent Settlement* (১৯৬৩) এ বিষয়ে একটি ক্ল্যাসিক হিসেবে গণ্য হয়। এই গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর পূর্বেকার লেখা *"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত"* (১৯৫৭) নামক বাংলা প্রবন্ধের খসড়া থেকেই পরবর্তীকালে জন্মলাভ করে। তিনি এই গ্রন্থে তিনি চমৎকার ভাবে ঔপনিবেশিক কালের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার উপরে নিদারুণ সমীক্ষা করেছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে যেসব সশস্ত্র কৃষক ও উপজাতীয় বিদ্রোহের উত্থান ঘটেছিল, তা রণজিৎ গুহকে অতীতে সংগঠিত এই ধরনের আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে আগ্রহী করেছিল। এটি করতে গিয়ে রণজিৎ গুহর মনে হয়েছিল পূর্বেকার ঐতিহাসিকরা শুধুমাত্র বৃহৎ ব্যক্তিবর্গ এবং নেতাদের কর্মকান্ডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের ঐতিহাসিক আখ্যান লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের দ্বারা নিম্নবর্গের ইতিহাস বারংবার উপেক্ষিত হয়েছে। সাব-অল্টার্ন চর্চার পথ প্রদর্শক রণজিৎ গুহ ১৭৮৩ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যবর্তী কালীন সময়কার গ্রামীণ ভারতের ঘটনাকে Subordination-এর

পরিপ্রেক্ষিতে চাষীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৮৩ সালে এই সমীক্ষাটি *Elementary Aspects of peasant Insurgency in Colonial India* নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি পরাধীন ভারতের ক্ষমতাহীন চাষীদের স্থানীয় জমিদারদের নিপীড়ন সহ ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস পেশ করে। গুহ চাষীদের চেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এই বইটি পন্ডিত মহলে যথেষ্ঠ সমাদৃত হয়। গ্রন্থটি নৃতত্ত্ব, উপনিবেশ ও উত্তর ঔপনিবেশিক চর্চাসহ ভারত ও এশিয়ার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে। গুহ পরামর্শ দেন যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে কিছু সরকারি নথি ও ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক অনুধাবন করা সম্ভব। যদি কেউ এ বিষয়ে আগ্রহী হয় তাহলে ঐতিহাসিক সরকারি নথিগুলির সঠিক অধ্যয়নের মাধ্যমে একটি প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

এক বিকল্প ভাষার প্রতিবাদের কেন্দ্রীয় স্বর হিসেবে রণজিৎ গুহর উত্থান ঘটে। কিন্তু শীঘ্রই এই স্বর কয়েকটি সম্মিলিত স্বরে পরিণত হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী তিন বছর ধরে সাব-অল্টার্ন চর্চা নিয়ে আগ্রহী গবেষকরা সাসেক্স, লন্ডন এবং অক্সফোর্ডের বিভিন্ন স্থানে সমবেত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। রণজিৎ গুহ কেন্দ্র করে এই গোষ্ঠীকে পরিচালনা করেন। এই গোষ্ঠীর গবেষকগণ অধিকাংশই গুহর ছাত্র ছিলেন। এরা গ্রামশি, থম্পসন এবং 'history from below' বা নিম্নতলের ইতিহাসের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৯৮০ সাল নাগাদ এই চর্চাটির উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতটি কিছু মাত্রায় আকার লাভ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতটিকে আমরা subalternist বলে সম্বোধন করতে পারি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, এই উপাদানগুলি কি কি? এই গোষ্ঠীর গবেষকরা যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক ভারতে রাজনীতির দুটি পৃথক কার্যক্ষেত্র ছিল, এগুলির মধ্যে একটি হল অভিজাত শ্রেণী বা elite এবং অপরটি হল নিম্নবর্গ বা Subalterna। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে শিক্ষিত অভিজাতদের এক প্রকার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। অভিজাতরা বিভিন্ন জনসভা, পিটিশন, সাংবাদিকতা ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাছে নিজেদের মত উপস্থাপন করতেন। এক্ষেত্রে অপর প্রান্তের কার্যক্ষেত্রটি গঠনের দিক থেকে পুরোপুরি আলাদা। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকরা একে প্রাক-রাজনৈতিক বা pre-political বলে অভিহিত করে থাকেন। যাদের কোনও স্পষ্ট দাবি নেই এবং স্বভাবতই এক্ষেত্রে মনে হয় যে তারা রাজনীতির কোনও প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতি অনুসরণ করে না। প্রায়শই সশস্ত্র কৃষক এবং আদিবাসী বিদ্রোহগুলিকে কৃষির দুর্দশার মতো অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংগ্রাম বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। গুহ এবং তার সহকর্মীরা যুক্তি দিয়ে দেখান যে, এই ধারণার বিপরীত একটি রাজনৈতিক কার্যক্ষেত্রের অবস্থান রয়েছে। কৃষক, আদিবাসী এবং বনভূমির বাসিন্দারা শুধুমাত্র ক্ষুধা বা বাসস্থানের স্বার্থে বিদ্রোহ করে না। তাদের বিদ্রোহ নির্দিষ্টভাবে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব, ভূ-স্বামীদের বা মহাজনদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। অনেকক্ষেত্রে এটি ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত হয়। এক্ষেত্রে আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা বলা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রে দাবি করে যে, স্থানীয় দেবতা তাদের বিদ্রোহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা একে নিছক কুসংস্কার বলে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের গবেষকরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে এই ধর্মীয় বিশ্বাস, লোককাহিনী, গুজবের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক যুক্তি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন।

রণজিৎ গুহর চিন্তার তাত্ত্বিক প্রভাব শুধুমাত্র মার্কসবাদে সীমাবদ্ধ ছিল না। তার চিন্তার পিছনে যে সব তাত্ত্বিক প্রভাব কাজ করেছিল, তা বহু শাখায় বিস্তৃত ছিল। রণজিৎ গুহ, সাব-অল্টার্ন শব্দটির দ্বারা প্রত্যেকটি মানুষকে বুঝিয়েছেন, যারা elite বা অভিজাত শ্রেণীর বাইরে অবস্থান করেন। একারণে তিনি কৃষকসহ প্রতিটি কর্মজীবী মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের আচরণের মধ্যে অভিজাতদের প্রতি অবাধ্যতা ও শ্রদ্ধার সমাহার লক্ষ্য করা যায়। গ্রামশির কাজের সঙ্গে সাব-অল্টার্ন চর্চার বহুক্ষেত্রে সম্পর্ক রয়েছে। রণজিৎ গুহ মুক্তভাবে হেগেল এবং হাইডেগারের প্রপঞ্চদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হন। এছাড়াও তিনি বাংলা সাহিত্য, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তবে তিনি কোনও ক্ষেত্রে সেমিওটিক্স,

ভাষা বিজ্ঞান, কাঠামোবাদ বা উত্তর-কাঠামোবাদের পরোক্ষ উল্লেখ করেননি। নতুন কোনও তাত্ত্বিক মতবাদ হাজির করা সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ চর্চার উদ্দেশ্য নয়। এই চর্চার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন তথ্যসূত্র একত্রিত করে ইতিহাসের অন্ধকার কোণটিকে আলোকজ্জ্বল করে তোলা। বিভিন্ন সময়ে রণজিৎ গুহ বাংলায় একাধিক প্রবন্ধ রচন করেছেন। এগুলির মধ্যে *রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা* (২০১০), *প্রেম বা প্রতারণা* (২০১৩) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এসেছে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, যেমন; *কবির নাম ও সর্বনাম* (২০০৯), *ছয় ঋতুর গান* (২০০৯), ইত্যাদি।

৮.৫ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এবং সাব-অলটার্ন চর্চা

'Can the Subaltern Speak?' প্রকাশ পাওয়া মাত্রই উত্তর-ঔপনিবেশিক চর্চার ক্ষেত্রে এক প্রামাণ্য কণ্ঠস্বরের ওপর বিখ্যাত নামে পরিণত হন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। বর্তমানে তিনি তার জ্ঞানচর্চার পরিধিকে মার্কসবাদ, নারীবাদের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছেন। উত্তর ঔপনিবেশিক চর্চার ক্ষেত্রে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বুদ্ধিজীবী মহলে এক পরিচিত নাম। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ১৯৪৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ডাঃ পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী এবং শিবানী চক্রবর্তীর কন্যাসন্তান হিসেবে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে কালকাতা ইউনিভার্সিটির নিয়ন্ত্রণাধীন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা চলার মাঝেই স্পিভাক কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা করেন। তিনি ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির গিরটন কলেজ থেকে ফেলোশিপ পান। ইউনিভার্সিটি অফ লোয়া (University of Lowa) এর একজন প্রশিক্ষক হিসেবে ভূমিকা সম্পূর্ণ করার পর স্পিভাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন। ১৯৬৭ সালে তিনি তুলনামূলক সাহিত্যে ডক্টরেট উপাধি পান। তার গবেষণায় বিষয় ছিল আইরিশ কবি ডব্লু বি ইয়েটস-এর জীবন ও কবিতা। নিউ ইয়র্কের কর্নেল ইউনিভার্সিটির প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Paul de Man এর তত্ত্বাবধানে স্পিভাক তার গবেষণা সম্পূর্ণ করেন। বর্তমানে তিনি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির হিউম্যানিটিজ বা মানবিকি বিদ্যার Avalon Foundation Professor। আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর থাকালীন স্পিভাক জাক দেরিদা এর সৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস প্রেস থেকে জাক দেরিদার 'দ্য লা গ্রামাতোলজি' অনুবাদের দায়িত্ব পান গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। অনুবাদের মাধ্যমে স্পিভাক ইংরেজি ভাষী মানুষের সঙ্গে দেরিদার ভাবনার এক চিরস্থায়ী সেতু রচনা করেন। জাক দেরিদার 'অফ গ্রামাতোলজি'-তে স্পিভাক কৃত মুখবন্ধ এখনও বহুচর্চিত। অধ্যাপনার পাশাপাশি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক অনুবাদও সমান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি রামপ্রসাদ সেন এবং মহাশ্বেতা দেবীর কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। তার সৃষ্টিগুলির মধ্যে *Thinking Academic Freedom in Gendered Post-Coloniality* (১৯৯২), *Outside in the Teaching Machine* (১৯৯৩), *A Critique of Postcolonial Reason* (১৯৯৯), ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০১৩ সালে ভারত সরকার গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে ভারত সরকারের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মান পদ্মভূষণে সম্মানিত করে।

সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা করেছেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক 'Subaltern studies : Deconstructing Historiography' নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের কয়েকটি দিক তুলে ধরেন, এগুলি হল— (a) Change and crisis (b) Cognitive failure is inevitable (c) Sublatern studies ad the European critique of Humanism (d) The problem of sublatern consciousness (e) Historygraphy of strategy (f) Rumour (g) Woman (i) concept metaphors of territoriality and of woman (ii) The communal mode of power and the concept of woman। তিনি তার Can the Subltern Speak? নামক প্রবন্ধে বলেছেন, আধিপত্যবাদীরা চিরকালই নিম্নবর্গীয় অপর বা others-দের self's shadow হিসেবেই নির্মাণ করেছেন। গায়ত্রী

চক্রবর্তী স্পিভাক তার প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন যে, মার্কসবাদী ধারণায় কিংবা মিশেল ফুকো প্রমুখের ভাবনায় যারা oppressed তারাও যখন সুযোগ পায় 'Can speak and know their condition'। তিনি বলেছেন, "According of Foucault and Deleuze (in the first world, under the standardization and regimentation of socialized capital, though they do not seem to recognize this) the oppressed, if given the choice (the problem of representation cannot be bypassed here), and on the way to solidarity through alliance politics (a Marxist thematic is at work here) can speak and know their conditions."। স্পিভাক মনে করছেন নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বরকে প্রতিষ্ঠাদানের জন্য সমষ্টিগত চেতনার প্রয়োজন। কারণ 'Subaltern consciousness as emergent collective consciousness'। তাহলেই উচ্চবর্গ নির্মাণের খোলসটি খসে পড়বে এবং নিম্নবর্গের প্রকৃত স্বরূপটি সবার সামনে উন্মোচিত হবে। এরজন্য নিম্নবর্গের 'নির্মাণ প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান', যাকে স্পিভাক "Affirmative deconstructions" বলে অভিহিত করেছেন।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তার সৃষ্ট তত্ত্বের মাধ্যমে ঔপনিবেশিকতার উত্তরাধিকারকে বারংবার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তিনি সেই ধারাকে স্বীকার করতে অসম্মত হয়েছেন যে, যা বলে পশ্চিম বিশ্বের যে হাত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর রয়েছে তা বর্বরতা থেকে অধিকত মুক্ত। তার তত্ত্বগুলি সমাজের সাব-অল্টার্ন বা নিম্ন বর্গীয় মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং সমাজে তাদের অবস্থানের মতো প্রান্তিক মানুষের বিষয়গুলি উপর আলোকপাত করে। স্পিভাক সমাজের প্রতিনিধিহীন গোষ্ঠীর মানুষদের বোঝাতে 'সাব-অল্টার্ন' শব্দটি গ্রামশির থেকে ধার করেছেন। বস্তুত ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে 'সাব-অল্টার্ন' শব্দটি তুলনমমূলকভাবে অধিক তাৎপর্য বহন করে, কারণ ভারতীয় জনগণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি নিম্নশ্রেণীর মানুষদের অবস্থানের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে 'সাব-অল্টার্ন' শব্দটি তার প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। তিনি তার প্রবন্ধ 'Can the Subaltern Speak?' এর মাধ্যমে সাব-অল্টার্নিটির এক নতুন দিশা উন্মুক্ত করেছেন। তিনি 'সাব-অল্টার্নরা কি কথা বলতে পারে?' জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিম্নবর্গের মানুষদের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি এখানে সাব-অল্টার্ন বলতে সমাজের নিপীড়িত মানুষদের বা আরও বিস্তৃতভাবে বলা যায় সমাজের 'নিম্ন মর্যাদা'র মানুষদের বুঝিয়েছেন। তিনি তার বক্তব্যে আরও যোগ করেছেন যে, ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপটে সাব-অল্টার্নদের কোনও ইতিহাস নেই এবং তারা কথা বলতে পারে না। স্পিভাকের মতে, সাব-অল্টার্ন একজন নারী হিসেবে অধিক অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। স্পিভাক তার 'Can the Sabaltern Speak?' প্রবন্ধের উপসংহারে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সাব-অল্টার্নরা কথা বলতে পারে না অর্থাৎ তাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। উত্তর-ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপটে স্পিভাকের বক্তব্য 'সাব-অল্টার্নরা কথা বলতে পারে না' অগ্নিশিখার উৎপাদ করেছে। প্রকৃতপক্ষে স্পিভাক তার বক্তব্যের মাধ্যমে এক কথায় সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এটি তার সারা জীবনের সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি, যা সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রণীত হয়েছে। তার তত্ত্ব একথাই বলে যে, সাব-অল্টার্নরা কথা বলতে পারে কিন্তু অন্যান্যদের তাদের কথা শোনার মতো ধৈর্য নেই। সাব-অল্টার্নদের দ্বারা প্রেরিত বার্তাটি নানাবিধ গোলযোগের কারণে অন্যান্যদের কাছে পৌঁছাতে পারে না। তবে, প্রকৃতপক্ষে সাব-অল্টার্নদের বার্তা শোনার জন্য শ্রোতাদেরও সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তার 'Can the Subltern Speak?' প্রবন্ধের মাধ্যমে নারীবাদী ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি তার প্রবন্ধে উন্নয়নশীল বিশ্বের মহিলাদের সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করেন, যা পূর্বে কখনই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত হয়নি। নারীবাদ মূলত সমগ্র পৃথিবীর নারীদের প্রতি শোষণ, বঞ্চনার কথা তুলে ধরে। তাই কোনও স্থানের নারীদের কথা এতে অনুপস্থিত থাকলে, তত্ত্বটি অসম্পূর্ণ। ইতিহাসের সর্বত্রই আঞ্চালিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই বিষয়গুলি তত্ত্ব গঠনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে, তাই এই বিষয়গুলি অধিক স্পষ্টভাবে

বিশ্লেষণ করা উচিত। সাধারণভাবে, নারীবাদ সম্পর্কে স্পিভাকের বক্তব্য নারীবাদের প্রচলিত ধারণাগুলিতে আঘাত হানে। স্পিভাকের মতে, পৃথিবীর প্রত্যেক মহিলা সমান নয় অর্থাৎ শ্রেণী, বর্ণ, জাতির বৈচিত্র্যের কারণে তাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় নারীদের আশা আকাঙক্ষা এশীয় মহাদেশের নারীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইউরোপীয় নারীরা তাদের পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য থেকে কম বেশি মুক্তি পায়, অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর নারীরা ইউরোপীয় নারীদের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে সংগ্রাম করছে। একটি সর্বজনীনভাবে সম্মত নারীলিঙ্গ তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ, তাই এখন সময় এসেছে নারীলিঙ্গের মধ্যে এই পার্থক্যগুলিকে সম্মান করার। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক নারীবাদের বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু তার যুক্তিগুলি নারীবাদের মূল নীতিগুলিকে অধিক শক্তিশালী করেছে। তিনি এই বাস্তবতার পুনরাবৃত্তি করে বলেন যে, নারীদের মধ্যে জাতি, শ্রেণী ধর্মী, নাগরিকত্ব এবং সংস্কৃতি বিশেষে পার্থক্য রয়েছে। নারীবাদকে এই বৈচিত্র্যের উপর মনোযোগ দিতে হবে যা প্রত্যেক নারীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান এবং নারীবাদকে তাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের সহায়তা করতে হবে। সাব-অল্টার্ন হিসেবে নারীরা তাদের ভিন্নমতকে সমাজের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের স্বরের সপক্ষে সমাজকে রাজি করানোর সুযোগ থাকে না। স্পিভাকের যুক্তির সপক্ষে এটিই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ১৮২৯ সালে ঔপনিবেশিক ভারতের শাসক হিসেবে ব্রিটিশরা বিধবাদের প্রাণ বিসর্জনের এই শতাব্দী প্রাচীন প্রথাকে বিলুপ্ত করতে উদ্যোগী হয়। 'সতী' বিধবাদের জন্য ব্যবহৃত একটি সংস্কৃত শব্দ, যখন কোনও সদ্য বিধবা স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যু ঘটলে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গলোকে একত্রিত হয়, তখন সে সমাজের চোখে একজন বিশ্বস্ত ও সৎ স্ত্রীর মর্যাদা পায়। ব্রিটিশরা 'সতী' শব্দটির পরিবর্তে সুতী শব্দটি উচ্চারণ করতে অধিক পছন্দ করত এবং ব্রিটিশরা তাদের উপনিবেশে সভ্যতা পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই প্রথা বিলুপ্ত করেন। ঔপনিবেশিক প্রভু হিসেবে ইংরেজরা এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে, 'White men saving brown women from brown men'। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড়ো হতাশা এই যে, ব্রিটিশরা এটা কখনই জানত না যে ভারতের কিছু নারী সত্যিই তাদের মৃত স্বামীদের সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় চিতাতে যোগ দিতে ইচ্ছুক। ধর্মশাস্ত্র এবং ঋক বেদের মতো প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে বিধবাদের এই আত্মবিসর্জনের প্রথাকে আত্মহত্যার পরিবর্তে মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এক পবিত্র প্রথা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্পিভাক তার 'Can the Subltern Speak?' প্রবন্ধে এই যুক্তি পেশ করেছেন যে, সতীকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিল। কারণ একজন শহীদ নিজের জন্য মৃত্যুবরণ করে না। অন্যদের জন্য তার রক্তের ধারা প্রবাহিত হয়, যাতে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুপস্থিত থাকে। যেসব মহিলারা নিজেদের আগুনে দগ্ধ করেছেন, তারা সতী হিসেবে শহীদ হয়েছেন। এই শহীদ হওয়া প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের প্রতিবাদ, কারণ তাদের আত্মীয়, পরিবার পরিজনরা সমাজে তাদের ভূমিকা স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

Can the Subaltern Speak? নামক এই আড়ম্বরপূর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমে স্পিভাক কোনও উত্তর পাওয়ার প্রত্যাশা করেন নি। তিনি মূলত রাষ্ট্রে নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনের অন্তরায়গুলি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। স্পিভাক তার প্রবন্ধে সতীদাহ প্রথার সমস্যাগুলোকে বিশদে আলোচনা করেছেন এবং 'সাব-অল্টার্নরা কথা বলতে পারে না' এই বক্তব্যের সপক্ষে নিজের অবস্থাকে অধিক জোরালো করেছেন। তিনি মনে করছেন, সমাজে নারীদের অবস্থা অধিক শোচনীয় এবং জটিল। নারীরা সমাজে পুরুষদের ইচ্ছা অনিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু তাদের নিজস্ব একটি কণ্ঠ স্বর রয়েছে, যাতে অসন্তোষ বর্তমান। যে সকল নারী সমাজে পিতৃতান্ত্রিকতার হিংসার শিকার হয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বক্তব্য ছিল, যার দ্বারা তারা সমাজে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা তাদের লেখনীতে এই ভিন্ন মতের কণ্ঠস্বরকে বিশেষত এই সাব-অল্টার্ন নারীদের কণ্ঠস্বরগুলিকে সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৮.৬ উপসংহার

১৯৮০-এর দশকে নিম্নবর্গ চর্চা যে অর্থ বহন করত, তা বর্তমান দিনে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ হল নিম্নবর্গ চর্চার বৌদ্ধিক পরিবেশে আমূল পরিবর্তন ঘটায়, এই বিষয় সংক্রান্ত পঠন-পাঠনকে যথেষ্ঠ প্রভাবিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে, সাব-অল্টার্ন চর্চার প্রকল্পটির বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ স্তরেও বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নিম্নবর্গের গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়গুলি বর্তমান গবেষকদের দ্বারা পৃথকভাবে পুনঃআবিষ্কার করা হয়েছে। সাব-অল্টার্ন চর্চার সূচনা হিসেবে বলা যায়, রণজিৎ গুহ এবং তার ছাত্ররা একটি ভারী পাথর শান্ত পুকুরে নিক্ষেপ করেছিল। এই কথার অর্থ হল, অবহেলিত মানুষদের ইতিহাস, যা বহুকাল ধরে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তা আজ বহু গবেষকদের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া, ইন্টারনেটের প্রসার ঘটার কারণে গবেষণার সুযোগ পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গবেষণার ফলাফলটিও দ্রুত পাঠকের সামনে পেশ করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস একটি অত্যন্ত জটিল এবং বিতর্কিত বিষয়। নিম্নবর্গের ইতিহাস সংক্রান্ত যে গবেষণা পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, তা কিছু পাঠকের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে এবং কিছু পাঠকের দ্বারা প্রত্যাখিত হয়েছে। বস্তুত 'সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ' গোষ্ঠীর লেখকরা নিম্নবর্গের নিজস্ব ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। তাদের মতে, ইতিহাস ব্যক্তিগত কারও নয়। নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ইতিহাসও হয় না, এ জন্য নিম্নবর্গের ইতিহাস অসম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল। তবে এই ইতিহাস 'অবদ্ধ ও সচল'। নিম্নবর্গের সংগ্রামের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার জন্য এখনও এ ইতিহাসচর্চা চলছে। প্রকৃত ইতিহাস উচ্চ/নিম্নবর্গের মিলিত জীবন ও সংগ্রাম; একে অপরের সম্পর্কে নির্মিত হয়। উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের মধ্যেকার বৈপরীত্য ও সম্পৃক্তি যথাযথভাবে বর্ণনা করতে হবে এবং একারণেই ইতিহাস নিম্নবর্গের ভূমিকাকে যথার্থ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে বলেন এ গোষ্ঠীর লেখকরা। আর এখানেই 'সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ' গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য; বিশ্ব জ্ঞানকান্ডের একটি বিশেষ সংযোজন।

২০১২ সাল নাগাদ বিবেক ছিব্বার (Vivek Chhibber) 'সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজে'র আদিপর্ব এবং তার গবেষণার মূল প্রকল্প নিয়ে আক্রমণ করে একটা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বিবেক ছিব্বার মূলত যে তিনজনের অধ্যায় ধরে ধরে আক্রমণ করেছেন তারা হলেন রণজিৎ গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও দীপেশ চক্রবর্তী। গৌতম ভদ্র, শাহিদ আমিনের নামের উল্লেখ মাত্র সেখানে নেই। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের নাম মাঝে মাঝে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং মূল তত্ত্ব প্রসঙ্গে তাঁরা সবাই সচেতন, তবে তত্ত্বীয় কাঠামোর দিক থেকে রণজিৎ গুহ, পার্থ, দীপেশ, গায়ত্রীর অবদান সবচেয়ে বেশি। পূর্বে, নিম্নবর্গের চর্চা মূলত ছাপার অক্ষরেই লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভিজ্যুয়াল টেক্সট, প্রচ্ছদ, অলংকরণ, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি এসব নিয়ে গবেষকরা আলোচনা করছেন। সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ বর্তমানে তাদের কর্মকান্ডকে গুটিয়ে নিয়েছে। নিম্নবর্গ চর্চার কাজে জড়িত প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব আলাদা বক্তব্য আছে। যেমন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিকালে যে তত্ত্বটা খুব আলোচিত সেটি হল—'সিভিল সোসাইটি' ও 'পলিটিক্যাল সোসাইটি'। কী করে যারা গণতন্ত্রে নিধিরাম, যাদের নামে গণতান্ত্রিক অধিকার আছে কিন্তু আসলে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রকরণগুলো যাদের অধিকারে নেই; তারা এই সিভিল সোসাইটি বা পৌর সমাজের বাইরে গিয়ে ক্ষমতার কী কী ব্যবহার করতে পারে। দলিত রাজনীতি ও নারীবাদী রাজনীতি যেটা পুরোপুরি সিভিল সোসাইটির প্রকরণ মানে না, আবার সিভিল সোসাইটির প্রকরণকে তাদের মতো করে ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে—এ সম্পর্কে নতুন চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। এটা কিন্তু পুরোপুরি কৃষক বিদ্রোহ বা শ্রমিক বিদ্রোহ নয়। অবস্থার হঠাৎ হঠাৎ গণবিক্ষোভ। সেগুলোকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'পলিটিক্যাল সোসাইটি' নামে দিয়েছেন তাঁর The Black hole of Empire: History of a Global Practice of Power, The Politics of the Governed: Reflections on popular politics in most of the world political society প্রভৃতি বিখ্যাত বইয়ের মধ্য দিয়ে। দীপেশ চক্রবর্তীর সম্প্রতি বাংলা বই যেটা হল

প্রচারিত 'ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ' পাঠ করলে দেখতে পাওয়া যায়, তিনি কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের ইতিহাস লিখছেন। কালচারাল স্ট্যাডিজ সাব-অল্টার্ন কালচারের একটা বড়ো অংশ। এছাড়া গণতন্ত্রের চরিত্র, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নানা দিকও সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ এসেছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে নতুনভাবে কাজ হচ্ছে।

সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ সর্বদাই তার প্রাতিষ্ঠানিক সীমানাকে প্রসারিত করেছে। সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে, যেমন এই নিম্নবর্গের চর্চার অন্যতম গবেষক গৌতম ভদ্রের কথায় 'বিরুদ্ধপক্ষ তো চিরকাল থাকবে। ভারতে দর্শনের কোনও বিকাশই প্রতিপক্ষ ছাড়া হয় না। প্রতিপক্ষ না থাকলে, পূর্বপক্ষ না থাকলে সিদ্ধান্তপক্ষ থাকে না। আমরা প্রতিপক্ষের সমালোচনাকে স্বাগত জানাই এবং প্রত্যাশা করি যে প্রতিপক্ষের সমালোচনা তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হবে, যাতে করে আমাদের সিদ্ধান্তপক্ষ আরও জোরদার হয়ে ওঠে। 'গত দশকগুলিতে সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের যেসব রচনা বাংলায় এবং ইংরেজিতে বেরিয়েছে তার প্রতিফলন সাহিত্যের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। ক্ষমতা বিন্যাসের নানা ধরন উচ্চ এবং নিম্ন উভয় বর্গকে নির্ধারণ করে। অবস্থানভেদে বর্গের ধরণও পালটায়। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা দেখি সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাসে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার চেয়ে গভীরতা সম্পন্ন নিম্নবর্গীয় উপাদান বিদ্যমান। সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক দীপেশ চক্রবর্তীর Community, state and the body : eipdemics and popular culture in colonial India (শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র : ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারি ও জনসংস্কৃতি ১৯৯৯) শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ রচনা এবং ডেভিড আর্নল্ড-এর যথাক্রমে Touching the body : Perspectives on the Indian Plague, 1896-1900 (১৯৮৭) ও Smallpox and Colonial Medicine in Nineteenth Century India (১৯৮৮) প্রবন্ধে উপস্থাপিত ভারতবর্ষের মহামারি প্রতিরোধে ব্রিটিশ শাসকদের অনুসৃত পথের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে আমরা করোনা-ভাইরাস কবলিত বিশ্বের অবস্থা পর্যালোচনা করতে পারি। দীপেশ চক্রবর্তী এবং ডেভিড আর্নল্ড দেখিয়েছেন ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারে গ্রামীণ সমাজে গোষ্ঠীগত মনোভাবের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল তা সরকারের মহামারি মোকাবিলা বা সংক্রমণ প্রতিরোধে নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল। কারণ লোকবিশ্বাস, অলৌকিকতা ও নানান সংস্কার নিম্নবর্গকে গুজবে বিশ্বাসী করে তোলে। অতীতে আমরা দেখেছি কায়েমি স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে অনেক সময় অনেক গুজব ছড়ানো হয়েছে। কিন্তু এসব গুজবের উদ্ভব সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব না হলেও এগুলো যে স্বতঃস্ফূর্ত আইন অমান্য করতে অনুপ্রেরণা জাগায় তা বলাবাহুল্য। একইভাবে ডেভিড আর্নল্ড তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন, ব্রিটিশ প্রবর্তিত স্বাস্থ্যনীতির অধীনে 'বসন্ত টিকা' সম্পর্কে ভারতবাসীর গুজবে বিশ্বাসের ফলে কিভাবে সেই জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম ব্যর্থ হল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র। গুজব রটেছিল টিকার উদ্দেশ্য জাত-ভাঙানো, ধর্মনাশ করা, নতুন করে বসানো কারখানায় জোর করে কুলি হিসেবে ধরে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি। পাঞ্জাবে রটানো হয় সূচের আকার লম্বায় এক গজ, শরীরে ফোটালেই হয় মৃত্যু নয় বন্ধ্যাত্ব, ডেপুটি কমিশনার সাহেব টিকা নিতে গিয়ে আধ ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগের পর মারা গেছেন। বুন্দেলখণ্ডে হেস্টিংসের সেনাবাহিনী যখন কলেরা আক্রান্ত হয় তখন সাধারণ মানুষের কাছে এর কারণ রটনা হয় অন্যভাবে। শ্বেতাঙ্গ সৈনিকরা জনৈক ব্রাহ্মণের নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে স্থানীয় রাজা হর্দুলকোনের স্মৃতিময় পবিত্র কোনও জায়গায় গোমাংস খাওয়ায় অধর্মাচরণের ফল হিসেবে কলেরায় আক্রান্ত হয়. ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা বিদায় নিয়েছে কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে ভারত এখনও কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের আচ্ছন্নতায় রয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ বর্তমানকালেও কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজ চিরকালই জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন দিগন্ত উপস্থাপন করেছে।

৮.৭ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

ক) রণজিত গুহর সাব-অলটার্ন চর্চার ব্যাখ্যা দিন।

৮.৮ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী :

i. Guha, Ranajit. (Ed.). (1988). *A Subaltern Studies Reader.* Minneapolis: University of Minnesota Press.

ii. Guha, Ranajit. (1997). *Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India.* Cambridge: Harvard University Press.

iii. Guha, Ranajit., & Spivak, Gayatri. C. (Ed.). (1988). *Selected Subaltern Studies.* New York: Oxford University Press.

iv. Sarkar, Sumit. (1977). The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies. In *Writing Social History.* Delhi: Oxford University Press.

v. Amin, Shahid., & Chakrabarty, Dipesh. (Ed.). (1996). *Subaltern Studies* (Vol. 9). Delhi: Oxford University Press.

vi. Spivak, Gayatri C. (1994). Can the Subaltern Speak? In L. C. Patrick Williams (Ed.), *Colonial Discourse and Postcolonial Theory: A Reader.* New York: Columbia University Press.